ভারত-সোভিয়েত চুক্তি

॥ পরিপ্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ ॥

সুখবীর চৌধুরী

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণি কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিশ্বাস করুন বা না করুন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণ সম্বন্ধে ভারতের জনগণের আবেগ ও ধারনার অভিব্যক্তি দেবার জন্য যে পরিস্থিতি আমাকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল তা ছিল অত্যন্ত উদ্দীপনাময়। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই ভারতের জনগণ সোভিয়েতের সময়োচিত ও অতি প্রয়োজনীয় সাহায্যের আন্তরিকতা প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এই সময় কয়েকটি স্থানীয় বিরোধের মীমাংসায় সাহায্য করতে আমাকে আমার গ্রামের বাড়িতে যেতে হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে আমি দেখলাম, গ্রামবাসীরা হুঁকো টানতে টানতে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। বঙ্গোপসাগরের দিকে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের অগ্রগতির সংবাদে আতঙ্কিত তাদের একজন সঙ্গীদের প্রশ্ন করল, "এখন কি হবে?" সোভিয়েত সাহায্য সম্পর্কে আস্থাশীল তাদেরই আর একজন আশ্বাস দিয়ে বলল, "ঘাবড়াও নেহি। রুশ সঙ্কটকা সাথী হায়। উয়ো হামারি পুরি মদত করে গা।"

তার ভবিষ্যংবাণী ফলে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই আকাশবাণীতে সোভিয়েত নৌবহরের ভারত মহাসাগর অভিমুখে অগ্রগতির সংবাদ ঘোষণা করা হল। বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল এই সংবাদে। গ্রামবাসীরা উৎসবের মন নিয়ে আনন্দে নৃত্য ও সোভিয়েত জয়গান করতে লাগল। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্বনি উঠতে লাগল, "দীর্ঘজীবী হও।"

দু'বছর বাদে ভারত আবার বিপদের সম্মুখীন হল। মজুতদার ও কালোবাজারীরা কৃত্রিম খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করল, দেখা দিল অনাহারের বিপদাশঙ্কা। জনগণের চোখে মুখে ফুটে উঠল বিষাদের গভীর ছায়া। সেই সময় আবার আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই লোকটির সঙ্গে। সহসা আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "এখন কি হবে বলে তোমার মনে হয়?" মনে হল, সে রুশদের প্রতি সমপরিমাণেই আস্থাশীল আছে। সে জোর গলায় বলল "ডরিয়ে মত। নির্ধন কা ভগওয়ান রুশ হায়। উয়ো কভি ভি হামেঁ ভুখা নেহি মরনে দেগা। রুশী বেনিয়া নেহিঁ হায় জো আউরোঁ কি তরা সওদেবাজি করে।"

আবার তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল। মাত্র একসপ্তাহ বাদে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এক বিশেষ বার্তায় ঘোষণা করলেন যে এ দেশকে ২০ লক্ষ টন গম ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে এবং পরে এ দেশের সুবিধামত সময়ে তা পরিশোধ করা চলবে। ভারতীয়েরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। আবার সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

রাজধানীতে ব্রেজনেভের উপস্থিতির দিনে 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরের দিকে সুধীর দারের একটি কার্টুন ছাপা হয়। ভারতের জনগণের এই মনোভাবের অভিব্যক্তি এর মত আর কিছুতেই এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়নি। কার্টুনে দেখান হয়, দেবাদিদেব মহাদেবের মত তিনি ভারতে আসছেন, তাঁর অসংখ্য হাতে ধরা রয়েছে ভারতের জনগনের অতি প্রয়োজনীয় 'খাদ্য', 'কেরোসিন', 'আর্থিক সাহায্য', 'প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম', 'কারিগরী সাহায্য', 'সাংস্কৃতিক বিনিময়', 'নিউজপ্রিন্ট' এবং 'এশীয় যৌথ নিরাপত্তা'। কার্টুনটিতে উপযুক্তই পাদটিকা ছিল—'রাশিয়া থেকে প্রীতিসহ'। রাশিয়া একটি ভুঁইফোড় বর্বর দেশ, সামরিক দিকে দিয়ে সে হয়তো অতি বৃহৎ শক্তির মর্যাদা অর্জন করেছে, কিন্তু তার উচ্চ সামাজিক মর্যাদা নেই, শুধু এদেশের প্রতি লোক-দেখানো বন্ধুত্ব দেখায় এবং যে কোন সময় এই বন্ধুত্বের ভাবখানা সে অনাবশ্যক বলে ঘুচিয়ে দিতে পারে—এই ধরনের কথা বলে ভারতের যে সব কৃত্রিম কূটতার্কিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবিশ্বাস করা একটা ফ্যাশন বলে মনে করেন, এই কার্টুনখানিই তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩ — সুখবীর চৌধুরী

নয়াদিল্লী

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক ঘটনার ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক অভিনন্দন বার্তার জবাবে সারা দুনিয়ায় শান্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার ও জনগণের সহযোগিতা চেয়ে যে বার্তা[১] পাঠিয়েছিলেন, তারপর ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে। ভারতের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্বে উপনিবেশবাদের সবচেয়ে গুরুতর পরিণতি—সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতারই শুধু অবসান হয়নি, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গড়ে উঠেছে মৈত্রীর এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধ, যার পেছনে ছিল দু'তরফেরই নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সমান আন্তরিক প্রয়াস।

এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার সূচনা। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে খাদ্য সংকটের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এদেশে তিন জাহাজ গম পাঠিয়ে বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত ও সোভিয়েত দেশের কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পরস্পরের দেশ সফর করে।[২] এই সময়ই কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘটাবার জন্য ভারতের প্রয়াস সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল প্রশংসা লাভ করে। ১৯৫৩ সালের পর দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক দীর্ঘমেয়াদী (পঞ্চবার্ষিক) বাণিজ্য চুক্তি। সেটা দ্বিপাক্ষিক সুষম বাণিজ্যের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালে শুরু হয় শিল্প ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাহায্যের জন্য ভারতের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচার-বিবেচনা করতে শুরু করে। একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ঐতিহাসিক ভিলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুআরি।

১৯৫৫ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ভিলাই চুক্তি স্বাক্ষরের পর কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারী সফরে গেলে তা এক বিরাট উৎসবের রূপ নেয়।

নেহরুর এই সফর ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় রকমের মোড় নেয়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত নেতারা এদেশে পালটা সফরে আসেন এবং ভারত তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগভরা অভিনন্দন জানায়। পরবর্তী বছরগুলিতে উভয় দেশের সম্পর্কের এই সোপানগুলি আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাশ্মীর[৩] ও গোয়ার[৪] মত সমস্ত বড় বড় রাজনৈতিক প্রশ্নেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং তেল, ভারী এঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ, ভেষজ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মৌল শিল্প স্থাপনে উদার হস্তে ঋণদান করেছে। এই সহযোগিতার ফলে ভারতে ৭০টিরও বেশী বৃহৎ কারখানা ও শিল্প প্রকল্প নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে। এইসব প্রকল্পে প্রতিশ্রুত মোট ঋণের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার বেশী। এইসব প্রকল্পের মধ্যে ভিলাই ইস্পাত কারখানা, হরিদ্বার ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কারখানা, রাঁচী ভারী যন্ত্র নির্মাণ কারখানা সহ প্রায় ৪০টি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে।[৫]

দু'দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য ও শান্তির প্রতি সাধারণ নিষ্ঠার জন্য ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এবং নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে দু'দেশের সম্মিলিত সংগ্রাম তরুণ উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণকে এক নতুন পথ নির্দেশ করেছে। ডালেস বলেছিলেন, 'নিরপেক্ষতা নীতি-বিগর্হিত' আর সোভিয়েত সরকার যথোচিত প্রশংসা করেছেন জোট-নিরপেক্ষ নীতির। লক্ষণীয় এ বৈসাদৃশ্য।

ভারতের স্বাধীনতালাভের পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। এই পঁচিশ বছর বাস্তবিকই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বহু লাভজনক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাধারণ প্রেক্ষাপট এবং শান্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রাম গত ২৬ বছরে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরস্পরের আরও অনেক কাছে টেনে এনেছে।[৬] পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে সক্রিয় পারস্পরিক সহযোগিতার যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তাতে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয় দু'বছর আগে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তাতে দু'দেশের মধ্যে বহু সাধারণ বন্ধনের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন মিলিতভাবে এক বিরাট শক্তি যা শুধু দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থই রক্ষা করতে সক্ষম নয়,

দুনিয়ার মুক্তি ও শান্তির সংগ্রামেও তা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[৭]

১। ২১শে অগস্ট, ১৯৭২ নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 'নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ ফ্রম দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' বুলেটিনে উদ্ধৃত বার্তার মূল বিবরণ, পৃষ্ঠা ৪।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন দেবেন্দ্র কৌশিকের 'সোভিয়েত রিলেশনস উইথ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' (দিল্লী, বিকাশ পাবলিকেশনস, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭, ৪০ ও ৫৮।

৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮।

৫। আরও বিবরণের জন্য দেখুন এম. এম. স্তাসভ এবং জি. কে. শিরোকভের 'ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড সোভিয়েত এড', সোভিয়েত রিভিউ (নয়াদিল্লী, ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ), ৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৩, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৭; ভ্যালেন্টিনা নিকোলায়েভা-তেরেসকোভার 'সোভিয়েত পিপলস রিজয়েস অ্যাট ইণ্ডিয়াজ অ্যাচিভমেন্ট্স', সোভিয়েত ল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ৭ই ফেব্রুআরি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০-৪৩, এবং 'এ কেস স্টাডি অব্ সোভিয়েত এড টু ইণ্ডিয়া', পয়েণ্ট অব্ ভিউ (নয়াদিল্লী), তৃতীয় খণ্ড, ৪৭নং, ১৭ই জানুআরি, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫।

৬। আরও পর্যালোচনার জন্য দেখুন, বিজয় এস. বুধরাজ-এর 'সোভিয়েত রাশিয়া অ্যাণ্ড দি হিন্দুস্থান সাবকন্টিনেন্ট (নয়াদিল্লী, সিমাইয়া পাবলিকেশনস, ১৯৭২), পৃষ্ঠা-২৬৪।

৭। আরও দেখুন খুশবন্ত সিং-এর সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ, 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' (বম্বে), ১২ই অগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুক্তির যৌক্তিকতা

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। উভয় দেশই অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে চুক্তিটিকে জীবন্ত করে তুলতে, আর একথা প্রমাণ করতে যে ইতিহাস হচ্ছে এক প্রবহমান স্রোতস্বিনী যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানব-জাতির কল্যাণের জন্য। ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসে এমন আর কোন অধ্যায়ের নজীর মেলে না যা এই চুক্তি স্বাক্ষরের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সমৃদ্ধ। পাকিস্তান চেঙ্গিসখানের মত এক শয়তানী নীতি ও বৈরীভাবাপন্ন অভিসন্ধি পোষণ করে আসছিল এবং তাতে মদত জোগাচ্ছিল চৌ এন লাই ও রিচার্ড নিকসন, যারা সব সময়ই তাদের তাঁবেদারের (পাকিস্তান) প্রতি গোপন সহানুভূতি প্রদর্শন করে এসেছে—একথা সম্পূর্ণ অবগত হয়েই ভারত দু'বছর আগে এই চুক্তি স্বাক্ষরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চুক্তি স্বাক্ষরের অল্পকাল পরেই চুক্তির শত্রুরা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, শুরু করে দেয় বিরাট শোরগোল এবং এর বিরুদ্ধে তাদের বিভ্রান্তিকর উপদেশামৃত বর্ষণ করতে থাকে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশ আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং সোভিয়েত সাহায্যের পরিমাণও আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই চুক্তি ভারতের স্বাধীন ইচ্ছা খর্ব করবে বলে ব্যাপকভাবে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল[১] তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রায় এই সময়ই 'দি শ্যাডো অব্ দি বিয়ার' (ভালুকের ছায়া)-ও প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র, জনসংঘ, কংগ্রেস (সংগঠন) ও ভারতীয় ক্রান্তি দল (বি কে ডি)—এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি কর্তৃক দিল্লীতে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে প্রদত্ত ভাষণগুলির সংকলন হচ্ছে এই গ্রন্থখানি। "এই লোকগুলো যে মুখ থুবড়ে পড়ল এটা দেখার"[২] আনন্দই শুধু এই গ্রন্থখানি থেকে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, এম. আর. মাসানি

বলেছিলেন, "পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে এর (এই চুক্তির) প্রতিক্রিয়া খুবই সংশয়জনক।" আচার্য কৃপালনী বলেছিলেন : "যুদ্ধের কোন আশঙ্কাই ছিল না।"[৩]

এখন এটা স্পষ্ট যে আমাদের স্বয়ং-নিযুক্ত রাজনৈতিক গুরুর দল কি ভুল করেছিলেন। চুক্তি সম্পর্কে গ্রন্থখানিতে সবাই মিলে যে রায় দিয়েছিলেন তা এখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এটা হবেই, কারণ ভাষণগুলি দিয়েছিল চুক্তির শত্রুরা। এই উক্তিগুলি সংকলন করার পেছনে যে একটা মতলববাজি ছিল সে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারত, এই ধরনের বক্তৃতা দেওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিল? কিন্তু যখন শত্রুদের অহংকার ও বিকৃত সংস্কারের রাজনৈতিক জট মনের গভীরে তখন কে কার পরোয়া করবে? এখনও এই রাজনৈতিক জটগুলি শিথিল হয় নি। ভারতে এমন সব শক্তি রয়েছে যারা ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু হাওয়া দ্রুত তাদের প্রতিকূলে বয়ে চলেছে।

এই চুক্তিতে যে কি লাভ হয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের যুদ্ধের সময়। সোভিয়েতের ভূমিকাই এই উপমহাদেশের ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ নিবারণ করে এবং এই অঞ্চলের সব আন্তঃ-রাষ্ট্র বিরোধ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার নীতি অনুমোদন করে।

এটা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে ঐ সময় মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে চীন ভারতের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করে পাকিস্তানের পক্ষে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চক্রান্ত করছে। যুগপৎ মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করছিল। সোভিয়েত কূটনীতিকেরা এই শত্রুতামূলক আচরণ সম্পর্কে উদাসীন না থেকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই এই বিপজ্জনক পন্থা গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ শুরু করে। কাঠমাণ্ডুতে সোভিয়েত ও ভারতীয় মিলিটারী এটাশেরা মার্কিন মিলিটারী এটাশে কর্নেল মেলাভিনের কাছে চীনা সৈন্যদের চলাচল এবং সপ্তম নৌবহর মোতায়েন করা সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা জানতে চান। সোভিয়েত এটাশে লগিনভ কাঠমাণ্ডুতে চীনা মিলিটারী এটাশে মিঃ চাও কুয়াং-চিহ্-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে উপদেশ দেন, এই ব্যাপারে চীন যেন হস্তক্ষেপ করার জন্য বেশী বাড়াবাড়ি না করে, কারণ তা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জবাব দেবে।[৪] ১৯৭১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিকোলাই পেগভ শ্রীমতী গান্ধীকে আশ্বাস দেন যে আক্রমণস্থল থেকে চীনের দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণের জন্য সোভিয়েত

চীনের বিরুদ্ধে সিনকিয়াং-এ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং সপ্তম নৌবহরকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। মিঃ পেগভ আরও মন্তব্য করেন যে ঢাকার মুক্তি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে না এবং এই সংকট সম্পর্কে ওদের মনোভাব পরিবর্তন করবে।[৫]

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রাভদা ও সৈন্যবাহিনীর সংবাদপত্র ক্রাসনায়া ভেজদা (রেড স্টার) ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের নিন্দা করে। ক্রাসনায়া ভেজদায় এক প্রবন্ধে ক্যাপ্টেন ভি. পুস্তভ বলেন, "ভারত মহাসাগর আমেরিকার একটি হ্রদ নয়।" তিনি প্রত্যক্ষ ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই নৌবহর মোতায়েনের নিন্দা করেন। সোভিয়েত ভাষ্যকার আরও বলেন যে এই সময় ভারতের উপকূলে মার্কিন প্ররোচনা "গানবোট এবং বিমানবাহী জাহাজী কূটনীতির" এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৯৭১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর প্রাভদা পেণ্টাগনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তারা সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির পরীক্ষিত অস্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করছে। তাতে আরও বলা হয় যে আমেরিকার গানবোট-নীতি—সারা বিশ্বে সৈন্য ছড়িয়ে দেবার নীতির ব্যর্থতা ক্রমশই আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত সমর্থন শুধু মৌখিক সহানুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মার্কিন নৌবাহিনীর টাস্ক ফোর্সের পিছনে পিছনে সোভিয়েত নৌবাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহর[৬] মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

অপরের অঞ্চলের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন অভিসন্ধি নেই। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভারত মহাসাগরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি স্থাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মহাসাগরে তার প্রভাব-ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য কোন আগ্রহ দেখায় নি।[৭] বরং ভারত মহাসাগরকে পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল হিসেবে রাখার জন্য ভারত যে দাবি তুলেছে তাতে সে সমর্থন জানিয়েছে। তাছাড়া, এশিয়া মহাদেশে এক বৃহৎশক্তি হিসেবে ভারতের ভূমিকার প্রতি সে শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তার সঙ্গে সে আচার-আচরণও করে মৈত্রী ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে। নেহরুর পঞ্চশীলের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সে ভারতকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেছে।

উভয় দেশের নেতাদের পরস্পরের দেশ সফরের সময় ভারতকে এক

মহান জাতি ও বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদের দেশ বলে উল্লেখ করা হয়। ভারত যাতে এক মজবুত অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারে সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে এবং তার সরকারী শিল্পক্ষেত্রকে বিশেষ করে ইস্পাত, লৌহেতর ধাতু, তেল, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও বিদ্যুৎ শিল্পকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিটি পর্যালোচনা করলে পারস্পরিক মর্যাদা ও মৈত্রীর বাস্তব সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন একান্ত-ভাবে কামনা করে ভারত তারই মত একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হোক যাতে তারা দু'জনে উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ-মুক্ত এক বিশ্ব গড়ে তুলতে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমেরিকা তা চায় না।

এই চুক্তির সমালোচকরা—এবং এদের সংখ্যা নগণ্য—যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের দাবি তুলেছে তারা দেখেও দেখছে না যে এশিয়ার যে দেশগুলো আমেরিকার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সেই দেশগুলিতে অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। তাদের রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থার প্রতি আমেরিকার গ্যারান্টিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার অবশ্যম্ভাবীরূপে বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার গলা টিপে মারা হচ্ছে।

১। ঐ সময় প্রচারিত কতকগুলি ভুয়া মতামত নীচে দেওয়া হল :

(i) "যুদ্ধে রাশিয়া ভারতকে সমর্থন করবে না"—শ্রীপাতিল।

(ii) "এই চুক্তিতে সন্নিবেশিত ধারাগুলি বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।"—সমর গুহ।

(iii) "চুক্তির কতকগুলি শর্তে বিপজ্জনক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে"—স্যোসালিস্ট পার্টি ও জনসংঘ।

(iv) "এই চুক্তিতে রাশিয়ার দ্ব্যর্থক বাক্‌চাতুরীর তাসখন্দীয় কূটনীতির যে অবসান হবে সে সম্ভাবনা খুবই কম"—এ. জি. নূরানি।

২। অনিল সি. ধারকরের মন্তব্য, "ইন্দো-সোভিয়েত ট্রিটি : এ রিভিউ অব থি বুক্‌স্ ট্রিটি"—টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া, ১৩ই ফেব্রুআরি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ৫।

৩। এ. পি. জৈন সম্পাদিত, 'দি শ্যাডো অব্ দি বিয়ার: দি ইন্দো-সোভিয়েত ট্রিটি' (নয়াদিল্লী, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ৯১।

৪। সুখবীর চৌধুরী কর্তৃক উল্লিখিত, 'ইন্দো-পাক ওআর অ্যাণ্ড বিগ পাওয়ার্স' (নয়াদিল্লী, ত্রিমূর্তি পাবলিকেশন্‌স, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ১১২-১৩।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৩।

৬। নৌশক্তি সম্পর্কে বিশ্বের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের একজন একদা বলেছিলেন যে নিজস্ব বিমানশাখা ও অধিকতর দূরপাল্লার সাবমেরিনে পুষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহর।

জেন-এর 'ফাইটিং শিপ্‌স'-এর সম্পাদক ক্যাপ্টেন জন মুর বিশ্বের নৌশক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণ্য এই বার্ষিক সংকলনের ১৯৭২-৭৩-এর সংস্করণে সম্পাদক হিসেবে প্রথম ভূমিকায় লিখেছিলেন যে সোভিয়েত নৌবাহিনীর গত বছরে "বিস্ময়কর অগ্রগতি" হয়েছে।

সোভিয়েত নৌবাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেন, "তিনটি প্রধান শ্রেণীর জাহাজের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রত্যেকখানিই ঐ শ্রেণীর পূর্ববর্তী জাহাজ অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ধরনের। তিনি আরও বলেন যে নির্মীয়মাণ 'কিয়েভ' বিমানবাহী জাহাজ, পূর্ববর্ণিত 'মস্কাভা' শ্রেণীর হেলিকপটার ক্রুজার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১০,০০০-টনী 'কারা' শ্রেণীর ক্রুজার পূর্ববর্তী যে-কোন ক্রুজার অপেক্ষা উন্নত ধরনের এবং নবনির্মিত 'বেলটা' ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিন আকারে 'ইয়াঙ্কি' শ্রেণীর মত তবে এটা নবনির্মিত ৬৬০০ কিলোমিটার পাল্লার 'এস এস এন-৮ ক্ষেপণাস্ত্র' বহন করতে পারে।

ক্যাপ্টেন মুর সোভিয়েত সাবমেরিনের তালিকার ১১১ খানি পরমাণুশক্তি-চালিত ও ৩০৫ খানি ডিজেল-চালিত যানের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে সোভিয়েত নৌবহরের দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে। যদিও তিনি নির্মীয়মাণ সাবমেরিনের সংখ্যার সামগ্রিক আনুমানিক হিসাব দেন নি।

[তথ্যগুলি উল্লিখিত হয় প্যাট্রিয়ট-এ (নয়াদিল্লী), ২৭শে জুন, ১৯৭৩ পৃষ্ঠা ৩, স্তম্ভ ২-৪।]

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণেও সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক এমনি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১৭ই অগস্ট ওআশিংটনে পেণ্টাগনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জেম্‌স আর. শ্লেসিঙ্গার স্বীকার করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে ক্ষেপণযোগ্য হাইড্রোজেন বোমাবাহী আই সি বি এম ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে এক বিরাট পদক্ষেপ করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে ফেলেছে। শ্লেসিঙ্গার আরও বলেন যে মনে হয় সোভিয়েত তাদের সবচেয়ে নতুন চারটি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (আই সি বি এম) নিয়ে এই অতিউন্নত অস্ত্রের প্রায় যুগপৎ পরীক্ষা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, "সোভিয়েত এক অতি দুঃসাহসিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।"

[সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ১৯শে অগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪, স্তম্ভ ৬।]

৭। বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দেখুন দেবেন্দ্র কৌশিকের 'দি ইণ্ডিয়ান ওশান: টুয়ার্ড্‌স এ পিস জোন' (দিল্লী, বিকাশ পাবলিকেশন্‌স, ১৯৭২)।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় নিরাপত্তা

(i) পশ্চিম পার্শ্বে বৈরীসুলভ সামরিক সমাবেশ

এটা অনস্বীকার্য যে ভারতের শত্রুদের অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার চটকদার চক্রান্ত থেকে নিবৃত্ত রাখার পক্ষে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। ভারতকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও এটা একটা বিরাট রক্ষা-কবচ ও গ্যারান্টি। পাক-ইরান-চীন অক্ষশক্তির মাধ্যমে তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে এক সশস্ত্র ফাঁস নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রভুরা এতে এমন প্রবলভাবে মদত যোগাচ্ছেন যে তাঁরা (প্রয়োজন হলে) সশস্ত্র যুদ্ধের রণাঙ্গনেও সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, যেমন তাঁরা করেছিলেন ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। তাই কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ এবং তাঁদের চীনা ও মার্কিন মদতদাতাদের দিক থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার পক্ষে এক গভীর বিপদ সর্বদাই বিদ্যমান। এই অবস্থায় এশিয়ায় কোন রকম শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টির পরিসন্ধান ভারতের পক্ষে এক রাজনৈতিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভারতের স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই ধরনের ভারসাম্য প্রয়োজন। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা, সবলের বৈরীসুলভ আচরণ ও কার্যকলাপ প্রতিরোধ, তাদের দুর্দম লিপ্সা দমন, শক্তির মদমত্ততা সংযতকরণ এবং বিশ্বে ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টিকারী যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষার ব্যাপারে এ এক সম্মিলিত প্রয়াস। নয়া উপনিবেশ-বাদের রূপপরিবর্তন ও অবিরাম বিরোধের অস্থিরতার ফলে যে আতঙ্ক ও আশঙ্কা দেখা দেয় তা নিবারণে শক্তির ভারসাম্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির রাজনীতির খেলা সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হ্যান্‌স জে. মর্গেনথাউ ঠিকই বলেছেন, 'সার্বভৌম দেশগুলির

সমাজে শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে শক্তির ভারসাম্য এবং সেই ভারসাম্য রক্ষার নীতি শুধু অপরিহার্যই নয়, অনিবার্যও বটে।'[১]

ওআশিংটন-তেহরান-পিণ্ডি-পিকিং জোটবন্ধন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে হলে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এই চতুঃশক্তির অক্ষগঠনের পথ প্রস্তুত করেছে তার পটভূমি গভীর-ভাবে অনুধাবন করতে হবে।

মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহার

আমেরিকা আর বহু মত-বৈপরীত্যের দেশ নয় যা এককালে মনে করতেন প্রখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক পণ্ডিত ফ্রেডারিক এল. সুম্যান। ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট একটানা চারবার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। তাঁর 'নববিধান' (নিউ ডীল) এবং 'ন্যায্য বিধান' (ফেয়ার ডীল)-এর স্মরণীয় যুগেই যৌথ শিল্প ও অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থা মেঘাবৃত হয়ে পড়ে। তারপর আসে আইকের শাসনকাল। অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক-শিল্প সমাহারের এজেণ্ট জন 'ফস্টার' ডালেসই হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা[২] এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইককে তা মেনে নিতে হয়। তারপর জন এফ. কেনেডির স্বল্লায় শাসনকাল। এই সময়ই ঘটে পিগ উপসাগরের বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের পরই প্রেসিডেণ্ট পররাষ্ট্রনীতি আমূল ঢেলে সাজার কাজে হাত দেন।[৩] রাজনৈতিক গণতন্ত্র অনেকদিন আগে থেকেই ক্ষমতাশালী ধনিক গোষ্ঠীর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।[৪] জনসাধারণের ক্ষমতা ও অর্থ মুষ্টিমেয় এমন কয়েকজনের স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছে যারা সরকারী সংস্থাগুলিকে সন্ত্রাসসৃষ্টি ও দমন-পীডনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে, যারা শুধু গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বিভাগই নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন ও মুনাফা অর্জনের বিরাট যন্ত্রকেও নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করেছে। তাদের সঙ্গে যাদের মতের অমিল তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে তারা শত্রু-তালিকাভুক্ত করেছে।[৫] তাদের চরিত্র ও জীবন হনন করাই তার উদ্দেশ্য। দুই কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হল, আলাবামার গভর্নর জর্জ ওয়ালেস হুইল চেয়ারে তাঁর অবসর জীবন কাটাবার সময়ও আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবে কোনক্রমে মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। এঁদের অপরাধ—এঁরা আমেরিকার প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করতেন বলে সেকথা নির্ভয়ে প্রকাশ এবং তা রূপায়িত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এই ধনিক গোষ্ঠী এমনভাবে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন যে স্বাধীন

নির্বাচন, বলপ্রয়োগ বা দেশের জনগণের জঙ্গী বিক্ষোভ প্রদর্শন দ্বারা এঁদের ধ্বংস বা ক্ষমতাচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব।[৬] মার্কিন গণতন্ত্রের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর উভয় সংকট।

আগে যেটি ছিল স্বাধীনতার দুর্গ, ধনিক গোষ্ঠী এইভাবে সেটিকে প্রতি-বিপ্লবের অস্ত্রাগারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সন্ধান শুরু হয়েছে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। 'ফস্টার ডালেসের পন্থা' অনুসরণ করে জনসন-প্রশাসন আবার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রগতিশীল গতিমুখ উল্টে দিলেন। তাঁদের কার্যকাল শেষ হল, এল নিক্সন-প্রশাসন। তারাও অনুসরণ করল পূর্বসূরীর জঙ্গীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণের কথা গলাবাজি করে ঘোষণা করে, তৃতীয় বিশ্বে অনুসৃত নিকসনের নীতির সমগ্র কর্মধারাই তার প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। একটির পর একটি দরিদ্র দেশে তারা মদত যুগিয়েছে, অত্যাচারীদের এবং স্বৈরাচারী শাসককুলকে ক্ষমতার আসনে বাহাল রাখার জন্য সাহায্য দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এরা অতি অন্যায়ভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বাধা দেবার চেষ্টা করছে এবং এ সবই এরা করছে গণতান্ত্রিক জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার অজুহাত দেখিয়ে।[৭] স্বাধীন বিশ্বের অধিকাংশ এবং জোট-নিরপেক্ষ বিশ্বের সকল দেশই মরিয়া হয়ে জানতে চেয়েছে, আমেরিকা কি চায়। ফরমোজায় চিয়াং-এর, দক্ষিণ ভিয়েতনামে থিউ-এর এবং আরব দুনিয়া, ইরান উপদ্বীপ ও ভারত উপ-মহাদেশের অনেক নগণ্য ডিক্টেটর ও নৃপতির মদতদাতা আমেরিকা এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। এই আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে ঢলে পড়ে এবং ভারতকে দুর্বল ও নিঃসহায় দেশে পরিণত করার চেষ্টা করতে থাকে।

ফ্রেডারিক এল. সুম্যান বলেছেন, বিগত প্রায় ছয় পুরুষ ধরে অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচরণে আমেরিকার জাতীয় উদ্দেশ্য বলতে বোঝায় সম্পৎশালী, উচ্চশ্রেণীজাত, ব্যবসায়ী চূড়ামণি, কারখানা মালিক, ব্যাঙ্কার, একচেটিয়া শিল্পপতি, স্টক এক্সচেঞ্জের পাণ্ডা, সরকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর যে সমস্ত সম্প্রদায় পর পর রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে তাদেরই উদ্দেশ্য এবং তাদেরই স্বার্থ ও লিপ্সা প্রতিফলিত হত তার মধ্যে।[৮] মার্কিন জীবনধারায় এরা এখন

এত শক্তিশালী যে লিঙ্কন, উইলসন, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, চেস্টার বোল্‌স, জন এফ. কেনেডি ও গলব্রেথের সময় যে অবিশ্বাস্য উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আজ গ্রাস করেছে এক অদ্ভুত লালসা। স্যুম্যান লিখেছেন, আমেরিকানরা পুজা দেয় ধন-দৌলতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বেদীতে এবং ধন সংগ্রহের অপ্রত্যাশিত সুযোগ গ্রহণ, অনুপার্জিত আয়, অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতা এবং বিরাট অপচয়ের খেলায় তারা মেতে আছে বলে বিদেশী সমালোচকরা যে মন্তব্য করেন তা অতি খাঁটি কথা।[৯]

এইসব ধনপতি শাসকগোষ্ঠী নিক্সন-প্রশাসনের মাধ্যমে এক সামরিক-শিল্প সমাহারের জাল বুনে চলেছে, যাদের কাছে অকল্পনীয় মুনাফা অর্জনের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সব কথাই অর্থহীন। এরা বিপুল পরিমাণ সমরসম্ভার বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে এবং এইভাবে সমৃদ্ধিলাভের লোভ এদের সীমাহীন। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থের ছদ্মবেশে সৎ কাজ হিসেবে এইসব কারবার চালানো হচ্ছে, আর শত্রুদের এই ধরনের কাজে কলঙ্ক আরোপ করা হচ্ছে। অস্ত্র বিক্রয় করে রাজকোষ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার এক হতাশাব্যঞ্জক এবং নিন্দনীয় রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সারকথা। নয়া উপনিবেশবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার নীতির দিকে পররাষ্ট্রনীতির ঝোঁক দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসন সারা বিশ্বে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যে এক বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা কয়েক সপ্তাহে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বছরের গোড়ার দিকে ইরানের শাহ্ ২৫ কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং এটিকে একটি দফার কারবার বলেই গণ্য করা হয়। তা দেখে আরব দুনিয়ার অন্যান্য সামন্ত নৃপতিরাও ঐ জালে ধরা দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্যর্ বেসিল জাহারফ মধ্য প্রাচ্যের দেশে দেশে উস্কানি দিয়ে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিতেন। ফলে তাদের প্রয়োজন হত অস্ত্রের। তখন তিনি তাদের কাছে তাঁর অস্ত্র বিক্রি করতেন। এইভাবে প্রচুর মুনাফা লুটেছিলেন। এইজন্য তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'মৃত্যুর ব্যবসায়ী' বলে। উইলসনের নেতৃত্বাধীন এবং তারপরও কিছুকাল ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নৈতিক আদর্শ স্থাপিত হয় তা ছিল যার-তার কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয়ের বিরোধী।

কিন্তু সে নীতি পাল্টে যায় ডালেসের আমলে। তখন অনেক দেশে

কম্যুনিজ্‌ম প্রতিরোধের নামে সবপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় বা বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয় অথচ ঐ সব দেশে কম্যুনিজ্‌মের নামগন্ধ ছিল না এবং যে-কোন লোককে দমন করার মত হাতিয়ার তাদের নিজেদেরই হাতে ছিল।

ফলে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি তিন গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালে যেখানে ১০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী হয়েছিল, ১৯৭১ সালে সেই রপ্তানির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ডলারে। অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিও তখন বাজারে প্রবেশ করে। ফলে সারা বিশ্বে অস্ত্র বিক্রয়ের মূল্য ২৪ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৬২ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়।

অস্ত্র বিক্রয়ের নতুন কর্মসূচী গ্রহণের ফলে আমেরিকার অস্ত্রখাতে আয় অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বেড়ে চলে। এই অস্ত্রবিক্রয় অভিযানের জন্য অবশ্য সব রকমের আজে-বাজে কৈফিয়ত দেখানো হয়। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে নিক্সন-প্রশাসনের ব্যাপকহারে অস্ত্রবিক্রয় অভিযানের পেছনে কতকগুলি মূলগত কারণ রয়েছে। প্রথম, মার্কিন রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমাবনতির এবং বাণিজ্যিক লেন-দেনে আমেরিকার বর্তমান বিরাট ঘাটতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়, রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী মার্কিন সমরশিল্পকে সাহায্য করা, কারণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি এবং সেখান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তৃতীয়, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসনকর্তৃপক্ষগুলির হাত শক্ত করা, কারণ আমেরিকার সামরিক-শিল্প সমাহারের ধনী ব্যারনদের কাছে তারাই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্রী; চতুর্থ, আমেরিকার পেণ্টাগন ছোটখাট যুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহী। তাদের কাছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ মোটেই অপচয় নয়; এটা ছিল তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অবাধ পরীক্ষাক্ষেত্র। ভিয়েতনামে তাদের অবাধ অস্ত্র-পরীক্ষার দিন কার্যতঃ শেষ হয়েছে, তাই পেণ্টাগন সিন্ধু উপত্যকায় অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে একান্ত আগ্রহী। পঞ্চম, মার্কিন সমর-নায়কদের সীমান্ত-সংঘর্ষ জীইয়ে রাখা এবং তাকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রবল ঐতিহ্য রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরকার সীমান্ত-সংঘর্ষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর আমেরিকা হাত বাড়ায় মেক্সিকো, কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। সেদিন পর্যন্ত তারা কোরিয়া, ইন্দোচীন, লাওস ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত-সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখন তারা একান্তভাবে চাইবে পাকিস্তান ও ইরানের চারপাশে সীমান্ত-সংঘর্ষের মত অবস্থার সৃষ্টি করতে যাতে মার্কিন সমর-

-নায়কেরা এই বিরাট সীমান্ত জুড়ে সংঘর্ষ বাধিয়ে প্রচুর মুনাফা লুটতে পারে।

পাকিস্তান এই খেলায় নাচতে নাচতে নামতে চায়। ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অবস্থা সে মেনে নেয় নি। একজন ভাষ্যকার লিখেছেন ভারতের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণে তার একমাত্র ভরসা, ভারতের সঙ্গে তার বিরোধে সে ইরান ও আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলতে পারবে।[10]

১৯৭১-এর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে পাকিস্তানকে পুনরায় অস্ত্রসাজ্জতকরণ

মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহার ১৯৭৩ সালের ১৪ই মার্চ পাকিস্তানকে পুনরায় সমরসম্ভার সরবরাহ শুরু করার উদ্যোগ নেয়।[11] এ থেকে বোঝা যায় যে ওআশিংটন আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে অগ্রসর হয়। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেট সেক্রেটারী সিস্কোর বক্তৃতা থেকে জানা যায়, প্রকৃত বিবেচনার পর্যায় ও পুনরায় অস্ত্র সরবরাহ শুরু করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল বড়জোর ২৪ ঘণ্টা। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সিস্কো যখন যবনিকা উত্তোলন করলেন তার আগেই পুনরায় অস্ত্র সরবরাহের নেপথ্য প্রস্তুতি অনেক দূরই এগিয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ৩০০ খানি সৈন্যবাহী যান যার মূল্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার (৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা) এবং ১১ লক্ষ ডলার (৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) মূল্যের সমর-অস্ত্রাংশ, প্যারাসুট ও মেরামত করা বিমান-এঞ্জিন বিক্রয় করা সম্ভব হয়।[12] পদস্থ মার্কিন আমলাদের বক্তব্য, আমেরিকাই প্রধানতঃ পাকিস্তানকে সমরসম্ভার সরবরাহ করে, তাই তার অস্ত্রাগার আমেরিকা থেকে অবিরাম অস্ত্রাংশ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

পাকিস্তানের এই অস্ত্র-ক্ষুধা বেড়েই চলতে থাকে। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে একদল মার্কিন সংবাদদাতার কাছে বলেন যে জুলাই-এর শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সময় তিনি ভারতের সঙ্গে তথাকথিত 'সামরিক সমতা' অর্জনের জন্ত পাকিস্তানে পুনরায় মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানাবেন। তিনি শেষে ফেটে পড়েন, ভারতের নেতৃত্ব আমরা মেনে নিতে পারি না, এই উপমহাদেশে তাকে প্রভাবশালী বা সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে দিতেও পারি না।

প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো যেসব মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন তাঁদের অধিকাংশেরই কর্মস্থল নয়াদিল্লী। পাকিস্তানে ও ভারতে মার্কিন দূতাবাসের

মাধ্যমে এঁদের রাওয়ালপিণ্ডিতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ই জুলাই, ১৯৭৩ নিউইয়র্ক টাইম্‌স ও ওআশিংটন পোস্ট দুখানি পত্রিকাতেই ভুট্টোর এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তখন ভুট্টোর ছয় দিন ধরে সরকারী ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার কথা ছিল।[১৩]

পাকিস্তানকে বছরের পর বছর ধরে ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে আমেরিকার দীর্ঘদিনের ঘৃণ্য খেলারই অঙ্গ। এর শোচনীয় পরিণতি এতদিনে সকলেই ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন। আমেরিকা এই অঞ্চলের স্বাভাবিক শক্তির ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে পাকিস্তানকে তার আয়তনের উপযুক্ত শক্তি হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার পথে বাধা দিয়েছে। পেণ্টাগন দুই দরিদ্র প্রতিবেশীর মধ্যে অস্ত্রক্রয়ের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের জাতীয় স্বয়ংভরতা অর্জনের গতি ব্যাহত করেছে। তাদের আরও জঘন্য কাজ হচ্ছে, পাকিস্তানে এক বিরাট সামরিক সংস্থা গড়ে তুলে তারা সেদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথ বিপন্ন করে তুলছে। এর ফলে পাকিস্তান দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।[১৪]

অস্ত্র সরবরাহের তীব্র সমালোচনা ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই জঘন্য অভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। দিল্লী রাজ্য শান্তি ও সংহতি সমিতির উদ্‌যোগে আয়োজিত এক জনসভায় শ্রীরমেশচন্দ্র বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ার জনগণের আন্দোলন দমন করতে চায়। তাদের সামরিক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, তাই যেখানে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না সেখানে তারা উস্কানি দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে।[১৫]

১৯৭৩ সালের ৩রা জুন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সমিতির সম্মেলনের গুজরাট শাখা কর্তৃক আয়োজিত এক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শ্রীরমেশচন্দ্র অভিযোগ করেন যে ভিয়েতনামে আমেরিকার অস্ত্রবিক্রয়ের বাজার বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তার অস্ত্রের বাজার বজায় রাখার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হোক। তিনি বলেন, ভিয়েতনামে প্রেরণের জন্য চিহ্নিত অস্ত্রসম্ভার এখন পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।[১৬]

তাছাড়া ১৯৭৩ সালের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত আমেরিকা নিয়েছে তাতে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে গভীর বিপদ দেখা দিয়েছে।[১৭]

সর্বোপরি ১৯৭৩ সালের ১৯শে মে সীতাপুরে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ বিভাগীয় কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি চায় না এমন কতকগুলি দেশ পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্রসাহায্য দিতে শুরু করায় এই দেশের নিরাপত্তার পক্ষে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে।[১৮]

কানাডায় সাম্প্রতিক সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী আবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে অন্যান্য দেশ পাকিস্তানের জঙ্গী মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিলে এই উপমহাদেশের জনগণের দারুণ ক্ষতি করা হবে। ১৯৭৩ সালের ১৮ই জুন অটোয়ায় কানাডার গভর্নর জেনারেল মিঃ মিচেনার শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে যে ভোজসভার আয়োজন করেন তাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।[১৯]

১৯৭৩ সালের ২৮শে মে নয়াদিল্লীতে 'ফোরাম অব্ ফিনান্শিয়াল রাইটার্স' আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে প্রশ্নোত্তরে ওআশিংটনস্থ প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা বলেন যে আমেরিকা কর্তৃক পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে তিনি বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছেন। এই অস্ত্রসাহায্যের পেছনে গভীর অভিসন্ধি থাকতে পারে।[২০]

১৯৭৩ সালের ২৪শে জুন অটোয়ায় টেলিভিশনে প্রচারের জন্য গৃহীত এক প্রশ্নোত্তর-কর্মসূচীতে শ্রীমতী গান্ধী আরও তিক্ত মন্তব্য করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্যের সমগ্র প্রশ্ন সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের মনে হয়, তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়।[২১]

ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণার প্রস্তাবগুলির যে জবাব পাকিস্তান সরকার দেয় তাতে ক্রমবর্ধমান আপস-বিরোধী উদ্ধত মনোভাব প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা পাকিস্তানে পুনরায় মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ ও ভুট্টোর প্রতি তাদের (আমেরিকার) অভ্রান্ত মদত এবং পাক সরকারের এই মনোভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করেছেন। পাকিস্তান কোন ইতিবাচক জবাব না দেওয়ায় সন্দেহ জাগে, যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্ন সম্পর্কে ভুট্টো প্রকৃতই আগ্রহান্বিত কি না! এতে আরও এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সহযোগীরা পাকিস্তানের আপস-বিরোধী

মনোভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে চাপে রাখা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাকে দুর্বল করা।[২২]

ইরানের শাহ্-এর সঙ্গে বিরাট অস্ত্রের কারবার:

পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জিত করা ছাড়াও মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহার পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তথাকথিত নতুন জবরদস্ত ব্যক্তি—ইরানের শাহ মহম্মদ রেজা পহ্লবিকে মদত যুগিয়ে চলেছে এবং তাকে অস্ত্রসজ্জিত করে চলেছে আতঙ্কজনক হারে।[২৩] এই শাহ্ একমাত্র আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সি আই এ) অনুগ্রহেই ইরানের ময়ূর সিংহাসন ভোগদখল করছেন। তাঁর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বজায় রাখার জন্য তিনি জনপ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বা শাহ্-এর বিরোধিতা করার মত নিজস্ব শক্তির ঘাঁটিওয়ালা সব রাজনীতিকদের বরখাস্ত, হত্যা বা নির্বাসনে পাঠাবার কাজে লাগিয়েছেন তাঁর সেনাবাহিনীকে ও বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাকে।[২৪]

এই ধরনের জঘন্য কাজের সবচেয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ডঃ মোসাদেগের মর্মান্তিক পরিণতি। ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে সেনাবাহিনী ও সি-আই-এ'র মাধ্যমে এই অপকর্ম সাধন করা হয়।[২৫]

ডঃ মোসাদেগ ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন এবং জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত এই তৈল সংস্থা থেকে যে আয় হবে তা সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে, দারিদ্র্য দূর করা হবে সকলের, সংগ্রাম চালানো হবে বিদেশীদের বিরুদ্ধে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার আদায় করা হবে। তাই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ যে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তা সত্ত্বেও সারা জাতির পক্ষে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল—ডঃ মোসাদেগকে পদিচ্যুত করা হল। জনসাধারণের জাতীয়তাবাদ ও আমূল সংস্কারকামী মতবাদের উন্মেষ উষালগ্নেই রাহুগ্রস্ত হল। রুবিকন অতিক্রম করা হল কিন্তু উল্টো দিক থেকে। পেন্টাগনের এই বিজয়লাভে শুরু হল লাভজনক দর কষাকষি। সংক্ষেপে বললে, তার ফল দাঁড়াল, মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি ব্রিটিশ ও পারস্যস্থ অন্যান্য বিদেশী তেল কোম্পানির কাছ থেকে তেলের ভার গ্রহণ করল এবং ইরানকে মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের 'প্রোটেক্টরেট'-এ পরিণত করার পথ প্রস্তুত করল।[২৬] দেশের সেনাবাহিনীকে নিজের খুশিমত পোষ মানিয়ে গড়ে তোলার শিক্ষা রাজা ভালই নিয়েছিলেন।

একদিকে শাসক শ্রেণীর ভূস্বামীদের শোষণে দেশের বিরাট জন-সমষ্টি চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগল,[২৭] অন্যদিকে শাহ্ একের পর এক অস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি করে তাঁর সামরিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে লাগলেন। প্রথম চুক্তি হল ডালেসের সঙ্গে ১৯৫৪ সালে ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র ক্রয়ের। তারপর হল তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট জনসনের সঙ্গে এফ-এইচ ফ্যাণ্টম জেট বিমান ক্রয় সম্পর্কে। পেণ্টাগন রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক ২০০,০০০,০০০ ডলার ঋণ দেয় এবং সেই অর্থে এই বিমানগুলি ক্রয় করা হয়। হুম্যান লিখেছেন, এই চুক্তিটি লাভজনক হয় শাহ্ ও বিভিন্ন মার্কিন কর্পোরেশন সহ সকলের পক্ষেই।[২৮] তেল বিক্রি করে যে ডলার অর্জিত হচ্ছিল তা ব্যয় হতে লাগল অংশতঃ শাহ্ ও তাঁর সৃষ্ট নতুন উচ্চশ্রেণীর তাঁবেদার গোষ্ঠীর জন্য, আর মোটা পরিমাণ অর্থ ঢালা হতে লাগল প্রতিরক্ষা বাজেটে।

গত দশকে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যয় দশগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে তার পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। আজ সারা দুনিয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের দিক থেকে ইরানের স্থান সম্ভবতঃ দশম। ১৯৭৩-৭৪-এর প্রতিরক্ষা বাজেট ১৯৭২-৭৩-এর প্রতিরক্ষা ব্যয় অপেক্ষা ৪৫ শতাংশ বেশী। পঞ্চাশের দশকে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল মোটামুটি মাঝারি ধরনের—১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ছিল ১০ কোটি ডলারেরও কম। ঐ দশকেরই দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ১০ কোটি থেকে ২৫ কোটি ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধেও প্রতিরক্ষা ব্যয়ে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ আর্থিক বছর থেকে এই ব্যয় দ্রুত বাড়তে থাকে। নীচের তালিকাতেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাবে:

বছর	পরিমাণ (ডলারের হিসাবে)
১৯৬২-৬৩	১২ কোটি ৫০ লক্ষ
১৯৬৩-৬৪	১৭ কোটি
১৯৬৪-৬৫	১৯ কোটি ৫০ লক্ষ
১৯৬৫-৬৬	২১ কোটি ৭০ লক্ষ
১৯৬৬-৬৭	২৬ কোটি
১৯৬৭-৬৮	৪৮ কোটি
১৯৬৮-৬৯	৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ

বছর	পরিমাণ (ডলারের হিসাবে)
১৯৬৯-৭০	৫০ কোটি ৫০ লক্ষ
১৯৭০-৭১	৭৭ কোটি ৯০ লক্ষ
১৯৭১-৭২	১০২ কোটি ৩০ লক্ষ
১৯৭২-৭৩	১৩৮ কোটি
১৯৭৩-৭৪	২০০ কোটি[২৯]

১৯৫১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যয় গড়পড়তা বার্ষিক ১৩'৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং এখন তা বেড়ে চলেছে আরও দ্রুত হারে।

বৃহত্তম সমর-সম্ভার সমাবেশ

ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকার হঠে আসার পর থেকে শাহ্ বিশ্বের বৃহত্তম সমর-সম্ভার সমাবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভ লিখেছেন, তেহ্রানের সমরনায়কেরা আমেরিকার কাছ থেকে সমর-সম্ভার ক্রয় করছেন (এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকেও কিছু কম পরিমাণে) যেভাবে অধিকাংশ মানুষ সুপার মার্কেট থেকে এক সপ্তাহের মুদিখানার জিনিস কিনে এনে মজুত করে রাখে।[৩০] শুধু ১৯৭৩ সালেই শাহ্ তাঁর তেলের আয় থেকে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করেছেন এবং গত ১৫ বছরে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য মোট যত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তেহ্রানের প্রভুরা পরবর্তী দু'বছরে তার চেয়েও বেশী ব্যয় করবেন বলে মনে হচ্ছে।[৩১] তাছাড়া, শাহ্-এর নজর বিদেশী অদ্ভুত ও অতি ব্যয়-বহুল অস্ত্রের দিকে—লেসার-চালিত বোমা এবং ফ্রান্সের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষেপণের অস্ত্র থেকে শুরু করে কে সি-১৩৫ জেট ট্যাঙ্কার পর্যন্ত তাঁর নজর। এই জেট ট্যাঙ্কারগুলি দিয়ে তিনি তাঁর ১৯০ খানি এফ-৪ ফ্যাণ্টম জঙ্গী বোমারু বিমান এবং ১০০ খানি এফ-৫ ই বিমানের বিরাট বহরকে মাঝ আকাশে নতুন করে তেল যোগান দিতে পারবেন (এর ফলে জেটের হানা দেবার পাল্লা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪০০ মাইলে গিয়ে দাঁড়াবে)।[৩২] আমেরিকার সামরিক-শিল্প কর্পোরেশনের কাছ থেকে শাহ্-এর সম্প্রতি কেনা সমরোপকরণগুলির মধ্যে আছে :

—১০৮ খানি এফ-৪ ফ্যাণ্টম যার মূল্য মোট ৭২ কোটি ডলার। অবশ্য শাহ্-এর এই ধরনের ৭২ খানি বিমান আগে থাকতেই কেনা আছে।

—১০০ খানি এফ-৫ ই জঙ্গী বিমান, মূল্য ৩০ কোটি ডলার ;

—১০ খানি কে সি-১৩৫ জেট ট্যাঙ্কার, মূল্য ৭ কোটি ডলার ;

—৭০০ হেলিকপটার, মূল্য ৫০ কোটি ডলার ;

—৮০০ ব্রিটিশ চীফটেন ট্যাঙ্ক, আনুমানিক মূল্য ৪৮ কোটি ডলার (শাহ্-এর হতে ইতিপূর্বেই কেনা আছে ৮৬০ খানা প্যাটন ট্যাঙ্ক) ;

—৮ খানি ডেস্ট্রয়ার, ৪ খানা ফ্রিগেট, ১২ খানা দ্রুতগামী গানবোট এবং ২ খানি মেরামতী জাহাজ, মূল্য প্রায় ৩০ কোটি ডলার ;

—১৪ খানা নতুন হোভারক্রাফ্ট, মূল্য ৩ কোটি ডলার (শাহ্-এর হোভারক্রাফ্ট বহর আগেই ছিল বিশ্বে বৃহত্তম, তার সঙ্গে যুক্ত হবে এই নতুন ১৪ খানা) ;

—২টি নতুন নৌ-বিমান ঘাঁটির সরঞ্জাম, মূল্য ১০০ কোটি ডলার।[৩৩]

এই সাম্প্রতিক সমর-সম্ভারে ইরানের সমর-শক্তি ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাবে। এখনই তার হোভারক্রাফ্ট বহর মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে উপসাগরের অপর পারে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নামিয়ে দিতে পারে। ব্রিটেনে নির্মিত বৃহদাকার বি এইচ-৭ বিমান দ্বারা পরিচালিত এই বহরটি, আর ঐ বি এইচ-৭ বিমান ১৫০ জন পর্যন্ত নৌ-সৈন্য নিয়ে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে যেতে পারে।

ইরান তার নৌ-বাহিনীকেও সম্প্রসারিত করেছে। পাঁচ বছর আগে শাহ্-এর নৌ-বাহিনী ছিল প্রধানতঃ বে-আইনী ভাবে মাল পাচার দমনের বাহিনী। আজ সে বাহিনী সারা উপসাগরে দ্রুত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম।[৩৪] অর্থাৎ নৌ-বাহিনীর আয়তন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি 'নিউজ উইক'-এর সম্পাদক আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শাহ্ নিজেই স্বীকার করেন যে ইরান 'স্মার্ট' বোমা অর্থাৎ লেসার ও টি ভি চালিত বোমা পাচ্ছে। তিনি বলেন, "পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য যেসব অস্ত্র আমেরিকার আছে তা সবই আমরা পাচ্ছি।"[৩৫] ব্রিটেনের কাছ থেকে শাহ্ ৮০০ খানা চীফটেন ট্যাঙ্ক ক্রয় করছেন। এর ফলে ইরানের ট্যাঙ্ক-বাহিনীতে ট্যাঙ্কের সংখ্যা ১৭০০-এর মত হবে।[৩৬] শাহ্-এর সশস্ত্র বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা আনুমানিক ১৯১,০০০।[৩৭]

ইরানের শাহ্ মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র কিনবেন :

ইরানের শাহ্ ১৯৭৩ সালের ২৪শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। তখন তার সমর-সম্ভার ক্রয়ের তালিকায় শুধু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত নৌ-বাহিনীর জঙ্গী বিমান 'টমক্যাট' (এফ-১৪)-ই ছিল না, ফিনিক্স

ক্ষেপণাস্ত্র ও দূর পাল্লার রাডার সহ অন্যান্য অতি উন্নত ধরনের সমরোপকরণও ছিল। এই রাডারগুলি সোভিয়েট বিমানে ব্যবহৃত রাডার অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ধরনের।

ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা গেল, প্রত্যেকটি এফ-৪ জঙ্গী বিমানের মূল্য প্রায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ডলার (প্রায় ১১ কোটি টাকা) এবং একটি ৫৪-এ ফিনিক্স ক্ষেপণাস্ত্রের মূল্য ২,৫০,০০০ ডলার (প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা)। এই এফ-১৪ জঙ্গী বিমানগুলি নির্মাণ করছে একটি জার্মান কর্পোরেশন মার্কিন নৌ-বাহিনীর জন্য এবং বিশ্বে সামরিক বিমানগুলির মধ্যে এরই মূল্য সর্বাধিক।

শাহ্ কতগুলি 'টমক্যাট' কিনতে চেয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় নি। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই উক্ত কর্পোরেশনকে শাহ্-এর কাছে টমক্যাট বিক্রয়ের অনুমতি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ইরানী অফিসারেরাও উক্ত কর্পোরেশনের সঙ্গে ফিনিক্স ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাধারণতঃ প্রত্যেকখানি বিমানের সঙ্গে ৩টি ক্ষেপণাস্ত্রের বরাদ্দ থাকে।[৩৮]

নৌ-বাহিনীর এফ-১৪ জঙ্গী বিমান হবে শাহ্-এর পূর্বে বর্ণিত অস্ত্রাগারে নতুন সংযোজন।

১৯৭৩ সালের ২৬শে জুলাই ওয়াশিংটনে এক বিবৃতিতে উপরোক্ত অস্ত্র ক্রয়ের সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে শাহ্ বলেন যে তিনি নিশ্চয়ই জার্মান কর্পোরেশনের কাছ থেকে এফ-১৪ জঙ্গী বিমান ক্রয়ে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তিনি মেরীল্যাণ্ডের অ্যাণ্ড্রুজ বিমান ঘাঁটিতে টমক্যাট বিমানের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন দেখবার বাসনা প্রকাশ করেন। টমক্যাট বিমানের দামের (দেড় কোটি থেকে দু'কোটি ডলারের মধ্যে) কথা উল্লেখ করে শাহ্ একজন সাংবাদিককে বলেন, "আপনাকে হয় সংখ্যা, অথবা মান এই দুই-এর মধ্যে যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে। আমরা চাই ভাল মানের জিনিস। ভাল জিনিস নিতে গেলে তার ভাল দাম দিতে তো হবেই। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের তা দেবার ক্ষমতা আছে।" শাহ্ আরও স্বীকার করেন যে এফ-৪ ফ্যাণ্টম জঙ্গী বোমারু বিমানের বিরাট বহর ছাড়াও তিনি এফ-১৪ বিমানও কিনতে চান। (স্মরণ থাকতে পারে যে এফ-১৪ হচ্ছে নৌ-বাহিনীর বিমান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধুনিক জঙ্গী বিমানকে রুখতে সক্ষম বলে বিশ্বাস)। আর

বিমান বাহিনীর এই ধরনের যে এফ-১৫ বিমান আছে তাও শাহ্ কিনতে চান। শাহ্ কতগুলি টমক্যাট কিনবেন তা বলেন নি, তবে পর্যবেক্ষকদের অনুমান এই সংখ্যা আট থেকে বারোর মধ্যে।[৩৯] তাঁর বিবৃতির অপরাংশও বিশেষ লক্ষণীয়। ঐ অংশে তিনি বলেছেন যে পারস্য উপসাগরে প্রভাবশালী রক্ষক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা ইরানের শুধু কর্তব্যই নয়, অদৃষ্টেরও লিখন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস, দশ বছরের মধ্যে আমরা আজকের ফ্রান্স, ব্রিটেন বা জার্মানীর মত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হব।"[৪০]

ভারতের পক্ষে আরও আতঙ্কজনক ঘটনা হচ্ছে, ফ্যান্টম, হেলিকপটার, গানশিপ, লেসার ও টি ভি চালিত বোমা, বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি অতি উন্নত ধরনের জটিল অস্ত্রাদির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ইরানী সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষাদানের এক বিরাট কর্মসূচী অনুযায়ী মার্কিন সামরিক বাহিনীর ১১,০০০ বিশেষজ্ঞকে ইরানে পাঠানো হয়েছে।[৪১] শত শত ইরানীকে ইস্রাইলে পাঠানো হয়েছে উন্নত ধরনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। তাছাড়া ওআশিংটন, তেহরান ও জেরুজালেম ঐ অঞ্চলে সামরিক শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করে তার তথ্য ত্রিমুখী বিনিময়ের জন্য এক সক্রিয় সংস্থা গঠন করেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার দিক থেকে আরও বিপজ্জনক ঘটনা হচ্ছে, ইরানী বালুচিস্তানে চাহ্ বাহার উপসাগরের তীরে একটি মালভূমিতে ৬০ কোটি ডলার ব্যয়ে স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর একটি ঘাঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এটিই হবে এই ধরনের বৃহত্তম ঘাঁটি। আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে এই ঘাঁটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করার জন্য মার্কিন ঠিকাদারেরা মাটি অপসারণের ২৫০ খানি অতিকায় যন্ত্র এনে কাজে লাগিয়েছে।

তাছাড়া সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ইস্ফাহানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হেলিকপটার ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ১৯৭৩ সালের বড়দিনের মধ্যে ৫০০ আমেরিকানের ইরানে পৌঁছবার কথা। 'ফিনান্শিয়াল টাইমস'-এর একটি সংবাদে প্রকাশ, ইরান তার সমর-প্রস্তুতিতে দ্রুত আঘাত হানার ক্ষমতা ও বিমান শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অতি শীঘ্রই সে ২০০ গানশিপ সহ ৭০০ হেলিকপটারের ডেলিভারি নেবে। উদ্দেশ্য, তার ১০০ খানি সি-১৩০ পরিবহণ বিমান বহরের শক্তি বৃদ্ধি।

এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে এটি একটি বিপজ্জনক অঞ্চলে পরিণত

হতে চলেছে। ভারতীয়রা যেন সহজে ভুলে না যান যে ইরানের নাদির শাহ্ই তাঁদের দেশ থেকে ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর নিয়ে গিয়েছিলেন।

শাহ্ যে বিবরণ দিয়েছেন তাছাড়া গোপন সূত্র থেকে ইরানের সমর-প্রস্তুতি সম্পর্কে আরও তথ্য জানা গেছে। পারস্য সর্বাধুনিক জঙ্গী বোমারু বিমান 'দি ঈগল' কিনতে চলছে। মার্কিন সামরিক-শিল্পে এই বিমানগুলি নির্মিত হচ্ছে। উপসাগর অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ চালাবার উপযুক্ত ৪ খানি লকহুড গ্রিয়ন বিমান, ৬ খানি বোয়িং ট্যাঙ্কার বিমান, হিউজেস টো ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বি এ সি রেপিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র (ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশে), ছোট সি-ক্যাট ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, বি এ সি সুয়িং, হালকা স্করপিয়ন ট্যাঙ্ক, ফক্স সাঁজোয়া পর্যবেক্ষণযান, সি কিলার এম কে-২ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষেপণাস্ত্র, ৪ খানি এস এ এ এম শ্রেণীর ফ্রিগেট এবং ২'খানি আধুনিক কায়দায় পুনরায় সজ্জিত অ্যালন সামার শ্রেণীর ডেস্ট্রয়ারেরও অর্ডার পারস্য দিয়েছে। এই সব সমরোপকরণের একটা মোটা অংশের ডেলিভারি সম্প্রতি দেওয়া হচ্ছে।[৪২]

প্রচলিত অস্ত্র দ্বারা আঘাত হানার শক্তি ও বিমান শক্তির দিক থেকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কজনক সমর-প্রস্তুতি, তা যেদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন। এতে চীন, জাপান, ভারত ও ইস্রাইলের মত শক্তিকেও ইরান ছাড়িয়ে যাবে। বহিরাক্রমণের বিপদের সঙ্গে এই সমর-সম্ভার মজুত করার কোন সম্পর্কই নেই, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিক থেকেও সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই এর লক্ষ্য মাত্র দুটিই হতে পারে। প্রথম, পশ্চিমে আরবের শেখ রাজ্যগুলিতে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান চূর্ণ করা; দ্বিতীয়, পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করা। সেক্ষেত্রে অতীতের মত ইরান পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।[৪৩] তবে শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধরনের দুঃসাহসিক ধ্বংসাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৯৭৩ সালের ১৯শে জুন অটোয়ায় কানাডীয় পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্যদের সমানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> সামরিক প্রস্তুতির গতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে, এটা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। বৃহৎ শক্তিবর্গ (পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে কটাক্ষ করে) ছোট ছোট দেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করে চলেছে। আগে করত ঠাণ্ডা লড়াই-এর তাগিদে, এখন

করছে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার অজুহাতে।...বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি স্থায়িত্ব আনতে পারে না, কারণ এতে অনিবার্য ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে যুদ্ধবাজরা, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাদের কোনই প্রয়োজন নেই।[৪৪]

ওআশিংটনস্থপ্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীএল কে ঝা-ও ১৯৭৩ সালে ২৮শে মে নয়াদিল্লীতে ফোরাম অব্ ফিনান্শিয়াল রাইটার্স আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে প্রশ্নোত্তরকালে আমেরিকা কর্তৃক ইরানকে অস্ত্রসজ্জিত করণের নিন্দা করেন এবং বলেন যে এটি নিশ্চয়ই ভারতের স্বার্থের অনুকূল নয়।[৪৫] এই সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে কে পি এস মেননও বলেন: "সুয়েজের 'পূর্ব থেকে জাপানের পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে' পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শাহ্ ঘোষণা করেছেন এবং মার্কিন সরকার যে রকম আগ্রহ নিয়ে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছেন তার আংশিক কারণ যে ভারতের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ এ সন্দেহ মনে না জেগে পারে না।[৪৬]

নিউজ উইকের বোর্চগ্রেভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শাহ্ সামরিক প্রস্তুতি অন্ততঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিকৃত ও মিথ্যা বিবরণ দেবার চেষ্টা করেন। ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, "দশ দিনের মধ্যে আমি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব" এবং ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাত্রে সত্যই তিনি তা করলেন, পাক বিমান বহর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিমান ক্ষেত্রগুলির ওপর বোমা বর্ষণ করল (ক্ষতিও হল প্রচুর) যার ফলে ভারত পালটা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হল। শাহ্ ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা ও পাক বিমান বহরের আক্রমণের ঘটনা নিজের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে 'তার সৈন্যবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের' নির্দেশ দানের ও পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ করার অভিযোগ আনেন এবং কুৎসা রটনা করেন। এই ধরনের ঘটনা-বর্ণনা ঠিক ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মত। এই অভিযোগ শুধু ভিত্তিহীনই নয়, এ এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক আবিষ্কার। তাছাড়া, এক কোটি উদ্বাস্তু যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছিল সে খবর বিশেষ কোন কারণে মনে হয় তাঁর কাছে পৌঁছয়নি (সক্রিয় রেডিও ও টেলিভিশন সার্ভিস তাঁর হস্তগত থাকা সত্ত্বেও)। তিনি প্রকৃত ঘটনা চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।

তাছাড়া যে ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের ফলে ভারত সোভিয়েত

ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হল তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপেক্ষা করে শাহ্ এটা এক বিপদ-ঘণ্টা হিসাবে গ্রহণ করলেন। আসন্ন সংঘর্ষে চীন যখন ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল* এবং কিসিঙ্গার ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং মারফত কোন সংঘর্ষ বাধলে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করলেন তখনই ভারত বাধ্য হল এমন এক মিত্র শক্তির সন্ধান করতে যে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে তাকে রক্ষা করতে পারবে। তার ফলেই হল ভারত-সোভিয়েত চুক্তি। ইরান যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে শত্রু হিসেবেই মনে করে, তাহলে ইরানে এই সব সমর-সম্ভার সমাবেশ শুধু প্ররোচনারই সৃষ্টি করবে, কখনই তা (সমর-সম্ভার) যথেষ্ট বলে মনে হবে না।

সম্প্রতি ইরানের শাহ্ যেসব বিবৃতি ছাড়ছেন এবং যে ধরনের হাল-চাল দেখাচ্ছেন তাতে ভারতে শুধু প্ররোচনারই সৃষ্টি হবে। তিনি বলেছেন, ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ও ইরাক-সোভিয়েত চুক্তির দ্বারা তাঁর দেশ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে তিনি বিপন্ন বোধ করছেন। ইরান ভাল করেই জানে যে ভারতের সঙ্গে তার কোন সাধারণ সীমান্ত নেই। তা সত্ত্বেও শাহ্ মনে করেছেন যে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ফলে ইরানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরও খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। স্পষ্টই বুঝা যায়, এটা শাহ্-এর আবিষ্কার এবং তাঁর আশঙ্কার অতিরঞ্জন। পাকিস্তানের অনুকূলে সোভিয়েত মধ্যস্থতাতেই যে ভারত দু'বার—১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে তার অধিকৃত পাক অঞ্চল পাকিস্তানকে ফেরত দিয়েছিল সে সত্যটা তিনি সহজেই উপেক্ষা করে গেছেন। তাছাড়া ভারতের ইতিহাসের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য হচ্ছে ভারত কখনও ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে বা সীমান্তের ওপারে আক্রমণ চালাবার স্বপ্নও দেখে নি।

ইরাকের কথাই ধরা যাক। সে দেশের এক লক্ষের চেয়ে সামান্য বেশী সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনী পারস্যের তুলনায় এমনই নগণ্য যে ইরানের পক্ষে সম্ভবতঃ সে কোন বিপদ সৃষ্টি করতেই পারে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, শাহ্ বাগদাদের বিরুদ্ধে কুর্দিদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন এবং উস্কানিও দিচ্ছেন। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইরাক বালুচিদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে। তবে শাহ্-এর কার্যকলাপের তুলনায় এ শুধু নিষ্ফল প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, সম্প্রতি ইরাকের বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজনে শাহ্-এর হাত ছিল। তাছাড়া, উত্তরে

বিপ্লবী ইরাক এবং দক্ষিণে গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক অতি-রঞ্জিত করে এবং পারস্য উপসাগরে সোভিয়েত অভিসন্ধির কথা রটিয়ে এক ভুয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করে শাহ্ তাঁর দেশকে মার্কিন সামরিক-শিল্পের কাছে সঁপে দিয়েছেন।

ইরান ক্রমাগত গুজব ছড়াচ্ছে যে রাশিয়া পাকিস্তানকে খণ্ড খণ্ড করার ধারাবাহিক আন্দোলনে মদত যোগাচ্ছে, ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ও ভারত মহাসাগরে এক প্রভাবশালী রাষ্ট্রে উন্নীত করার চেষ্টা করছে, আর পারস্য উপসাগর-তীরে ইরানের পশ্চিম পার্শ্বে 'অন্তর্ঘাতমূলক' কার্যকলাপে সমর্থন দিচ্ছে।[৪৭]

তাছাড়া, পাকিস্তানের 'ধর্মপিতা' আমেরিকা পাকিস্তানের বিভাগ মেনে নেয় নি। নিক্সন-প্রশাসন আবার ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এক নোংরা খেলা খেলতে পারে, বিশেষ করে তার দেশ যখন আর ভিয়েতনামে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত নয়। মার্কিন প্রশাসন ভারতের যুক্তি মেনে নেবে এটা আশা করা বৃথা।

এরূপ এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ভারতের উদাসীনতা শুধু তার নিজের জাতীয় নিরপত্তাই বিপন্ন করে তুলবে।

ভারত-সোভিয়েত চুক্তির শর্তগুলি যতদিন সততার সঙ্গে অনুসরণ করা হবে ততদিন এই চুক্তিটি এই উপমহাদেশে যে-কোন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে রাখবে। ইরান তার বোমারু বিমানবহর হানা দিতে পাঠাতে সাহস পাবে না, ভারতের বুকে আক্রমণ চালাবার জন্য পাকিস্তান তার স্থলবাহিনীকে নামাতে পারবে না, চীনারাও দিল্লী বা কলকাতাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবে না, পেন্টাগনও ভারত মহাসাগরে তার সপ্তম নৌবহরের চলাচলের ব্যাপারটি হালকা ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

সম্প্রতি ভারতের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির কিছু সংখ্যক শাহ-এর চাটুকার তড়িঘড়ি আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভারতীয়দের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে চান যে ইরানের অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। তাঁরা এক অদ্ভুত ধরনের বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁরা বলছেন যে ভারত ও ইরানের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে। কিছুদিন আগে শাহ্ যেসব বৈরীসুলভ বিবৃতি ছাড়েন এবং ১৯৭৩ সালের ২৮শে জুন ইরানী বেতারে যে ঘোষণা করা হয় সেগুলি তাঁরা এই যুক্তি খাড়া করার

সময় বেমালুম চেপে গেছেন। ঐ সব বিবৃতি ও ঘোষণায় বলা হয় যে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে ইরান তার সম্ভবপর সব সাহায্য পাকিস্তানকে দেবে।[৪৮] এ সত্ত্বেও বলা হচ্ছে যে ইরানের অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। এই ধরনের বিবৃতি অর্থহীন। সারা বিশ্ব এখনও কোরীয় যুদ্ধের সূচনা নিয়ে বিতর্ক করছে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে কখন যুদ্ধ বেধেছিল বা পাকিস্তানের আধা-সামরিক বাহিনী কখন জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করেছিল এ বিষয়ে কখনই মতৈক্য হবে না। কারণ যুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে কেউ রায় দেয় না। অধিকাংশ লোকই নিজের মনের দর্পণে দৃষ্টিপাত করে রায় দিয়ে থাকে। আর শাহ্-এর কথা বলতে গেলে, তাঁর পাকিস্তান-ঘেঁষা মনোভাব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিতে পারে না। ইন্দার মালহোত্রা মন্তব্য করেছেন, "ভারতের বিরুদ্ধে অতীতে দুবার পাকিস্তানকে আক্রমণের অভিযোগ না করলেও তিনি ঐ একই কথা বলেছেন একটু ঘুরিয়ে, তবে সেটা আরও ক্ষতিকারক। বিদেশী সংবাদিকদের কাছে, ভুট্টোর সাম্প্রতিক ইরান সফরের পর প্রচারিত যুক্ত ইস্তাহারে এবং তেহ্‌রানে 'সেণ্টোর' মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এক বাণীতে তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে বার বার যেসব কথা বলে গেছেন সেগুলি পড়লে এদেশে তাঁর ঢাক-পেটানোর দল ভালো করবেন।"[৯৪]

সুতরাং এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পাকিস্তান যদি এ দেশের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধাবার সিদ্ধান্ত করে, সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ইরান সর্বাত্মক সাহায্য দেবে এবং তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন দেশই তার সীমান্তের কাছে এবং তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন অঞ্চলে আকস্মিক কোন বিরাট সামরিক শক্তির সমাবেশে উদাসীন থাকতে পারে না। পঞ্চাশের দশকে ভারত তার সীমান্তে চীনের সামরিক শক্তিকে যুক্তি দেখিয়ে শান্ত করতে পারেনি, তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক ১৯৬২ সালে এবং তার ভীতি এখনও কাটে নি।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে যখন মার্কিন সামরিক সাহায্য আসতে শুরু করল আমরা তখন তার বিরুদ্ধে অনেক হৈ-চৈ করেছিলাম, কিন্তু ঐ সব অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেমন কিছুই করি নি।

ভারতের বুর্জোয়া চাটুকারেরা শাহ্-এর এই ধরনের তথ্য-বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। ১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১—এই তিন

যুদ্ধে প্রতিবারই পাকিস্তান প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে এবং ভারতের কাছে প্রতিহত ও ভীষণভাবে পেটানি খাবার পর নিজের ক্ষত চাটতে চাটতে সে আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে আর্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে এবং বাইরে, বিশেষ করে ইরান ও আরব এমনকি আমেরিকার কাছেও সাহায্য ভিক্ষা করেছে। শাহ্ অতি সহজেই এই মৌলিক সত্য উপেক্ষা করে গেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সব সংঘর্ষের সময়ই শাহ্ প্রকৃত অবস্থার গুণাগুণ বিচার না করেই আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে মৈত্রীর জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেছি। সর্দার স্বরণ সিং-এর সাম্প্রতিক ইরান সফরের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। আমাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। শাহ্-এর তোষামোদ করে আমরা কোন ফল পাই নি, এটাই হচ্ছে নির্মম পরিহাস। এতে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। ভারত-বিরোধী বিবৃতি দিয়ে শাহ্ কে কাকে আক্রমণ করল তার একমাত্র বিচারক হতে চান। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে দুবারই শাহ্ এই সব সংঘর্ষের কারণগুলির গভীরে না গিয়েই সিদ্ধান্ত নেন যে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে। এটা স্পষ্ট যে দুবারই ইরান পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে সামরিক সাহায্য দিয়েছিল। মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের পক্ষে এটা একটা সুবিধাজনক পথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ৮ই মে উচ্চপদস্থ পাক আমলাদের প্রচারিত এক বিবৃতিতে দুটি যুদ্ধের সময়ই পাকিস্তানের প্রতি ইরানের শাহ্-এর সমর্থনের কথা প্রকাশ করা হয়। এতে আরও প্রকাশ পায়, শাহ্ তেহ্রানস্থ পাক দূতাবাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "দিনে বা রাত্রে যখনই হোক পাকিস্তানের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলেই যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।" এতে আরও বলা হয়, "গোলাবারুদ ও বিমান সহ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমরোপকরণের দারুণ অভাব দেখা দেয় এবং ইরানের দ্রুত সাহায্যদানে সে অভাবও পূরণ হয়।" পাক সরকারী বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, "পাকিস্তানী বিমান বহর সারা দিন-রাত ইরান থেকেই হানা দিতে আসে।" পাকিস্তানের প্রতি ইরানের "মৈত্রীসুলভ" সাহায্যের এই তালিকা নিশ্চয়ই চোখ খুলে দেবে। ভারতীয় চাটুকারেরা সহজেই ভুলে যান যে পাকিস্তান ও ইরান ১৯৬৫ বা ১৯৭১ সাল অপেক্ষা এখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন যুদ্ধ হলে ভুট্টোর প্রতি শাহ্-এর সমর্থন যে অনেক বেশী ব্যাপক হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইরানের দুর্নীতিপরায়ণ সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ইরানে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে।[৫০] জনমতকে টুঁটি টিপে মেরেছে, ডঃ মোসাদেগের গণতান্ত্রিক সরকারকে, অবশ্য সি আই এ'র সাহায্য নিয়ে, উৎখাত করে সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ অমান্য করেছে এবং এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের ধর্মান্ধ সরকারের সমর্থন লাভের চেষ্টা করছে। এহেন রাজতন্ত্রকে সমর্থন করার মধ্যে ভারতীয় বুর্জোয়া চাটুকারেরা বিস্ময়জনকভাবে গর্ব অনুভব করে থাকেন। এটা চরম নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। তা ছাড়া, সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে, যে দেশ ব্রিটিশ ও জারের সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠে ডঃ মোসাদেগের আমলে শাহ্‌কে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করে স্বাধীন সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মর্যাদা অর্জন করেছিল সে দেশ আবার মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহারের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণী এবং ইরানের পুরনো সামন্ততন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড আঁতাত গড়ে উঠেছে। ভারত গণতন্ত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর ইরান সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রাহুগ্রস্ত। এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই দুই দেশের মধ্যে কোনরূপ অর্থপূর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা কি বিস্ময়কর নয়? প্রতিক্রিয়া ও আধুনিকতার মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে, ধ্বংসের অচল-অনড় গহ্বরে ক্রমশ নিমজ্জমান মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর বিরাট সৌধ এবং সকল দিক থেকে উন্নতিশীল একটি আধুনিক দেশের মধ্যে এটা এক অসম্ভব মৈত্রী-বন্ধনের প্রশ্ন। এই ধরনের অসুস্থ প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে ভারতীয় চাটুকারদের তাদের মতামতের বিষয়ে আর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শাহ্ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন বলে বিশেষভাবে প্রচার করে ভারতীয় বুর্জোয়া চাটুকারেরা এ দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে চায়, অথচ শাহ কতবারই না কত কথায় এই অভিযোগ পশ্চিমী সাংবাদিকের কাছে তুলে ধরেছেন। কেউ জানে না কে সত্য কথা বলছে। হয় শাহ একই সঙ্গে নরম-গরম ছেড়ে দুনিয়াকে বিভ্রান্ত করেছেন, নয়তো ভারতীয় সাংবাদিকেরা ভারতীয়দের তাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে রাখতে চাইছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ভারতীয় গণতন্ত্র নয়, ভুট্টোর স্বৈরাচারী শাসনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের জনগণের নিজেদের নির্বাচিত সরকার গঠনের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করে

পাকিস্তানে আর এক ভিয়েতনাম সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করছে। ভুট্টো যখন ঘোষণা করেন যে তিনি বালুচিস্তানে ন্যাপ-জমিয়ত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নন তখন ইরানের শাহ্ ভুট্টোর এই কাজে অভিনন্দন জানান। বালুচিস্তানের জনগণের রায় ঘোষণার পর পাকিস্তানের ব্যাপারে মাথা গলবার এবং তার ইচ্ছা নির্দেশ করার অধিকার ইরানের শাহ্‌কে কে দিয়েছে? তিনি যেন মনে রাখেন যে কোন ঘরের আগুন নেভাবার যোগ্য একমাত্র প্রতিবেশী তিনি নন। আরও অনেক প্রতিবেশী আছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন, আফগানিস্তান, ভারত প্রভৃতি—যারা শাহ্-এর নীতি গ্রহণ করা হলে নিজেদের অধিকার-বলেই সংঘর্ষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এটা সুস্পষ্ট যে ঐ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে শাহ্, ভুট্টো ও নিক্সন একযোগে দাঁড়াবেন ইন্দিরা, বক্র ও কোসিগিনের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে শাহ্ তাঁর শুঁড় বিস্তার করছেন। ইরানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা—এটাই ছিল তাঁর প্রথম দিকের বক্তব্য। মার্কিন অস্ত্র ক্রমাগত আসতে থাকায় তিনি এখন আরও কিছু দাবি করছেন। তাঁর ঘোষিত প্রাথমিক প্রয়োজন এখন আরও বেড়ে গেছে। তিনি এখন আঞ্চলিক দায়িত্ব নিরাপদ রাখার কথা বলতে শুরু করেছেন এবং অঞ্চল বলতে ভূগোলে যা বোঝায় তা তিনি মানতে রাজী নন। শাহ্-এর এই ধরনের দুঃসাহসিক অভিযান চালাবার, ব্ল্যাকমেল করার ও, সম্প্রসারণবাদী মনোভাব ও হালচাল এবং তাতে পেন্টাগনের গোপন অনুমোদন ও উৎসাহদানের ফলে পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং শেষে তা থেকে এক যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। ইরানের শাহের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের ফলে বালুচিস্তান, আজাদ কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ধূমায়িত অসন্তোষ মিলিতভাবে দানা বেঁধেছে। কোন্ দেশ প্রথম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল তার বিচার করবেন ঐতিহাসিকেরা। তবে মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া একবার শুরু হয়ে গেলে পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বহিঃশক্তির চাপে ধ্বসে পড়বে।

শাহ ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানের বালুচিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যদি দানা বেঁধে ওঠে তাহলে ইরানে তার তথাকথিত আত্মরক্ষা-মূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে অর্থাৎ তিনি বালুচিস্তান এবং পাকিস্তানের অন্য যে-কোন অঞ্চল পারেন তো দখল করে নেবেন। একদিক থেকে তিনি তা ইতিমধ্যেই করেছেন। পেশোয়ারের উর্দু দৈনিক 'শাহবাজ'-এ প্রকাশ, পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জনপ্রিয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন দমনে

উক্ত প্রদেশে ইতিমধ্যেই বহু ইরানী সৈন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের অগস্ট মাসে এই ইরানী সৈন্যদের সাহিদান থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন যোগে মাস্তুং রেল স্টেশনে পাঠানো হয়। উক্ত পাক পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে যে রাজকুমারী আসরফ পহ্লবি সম্প্রতি নয়াদিল্লী যাওয়ার পথে কোয়েটায় থেমে ইরানী সৈন্যদের পরিদর্শন করে যান। মাকরান উপকূল অঞ্চল থেকে আগত পর্যটকদের প্রদত্ত সংবাদ উদ্ধৃত করে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের জিওয়ানি, গোয়াদার ও পাস্নই বন্দরে ইরানী যুদ্ধজাহাজ সব নোঙর ফেলে রয়েছে।[৫১] এদিকে করাচীর 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ, ন্যাপ-প্রধান ওয়ালি খান আবার অভিযোগ করেছেন যে ইরানের শাহ্-এর নির্দেশেই বালুচিস্তানের জনপ্রিয় সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।[৫২]

ভুট্টোর ইরান সফরের তাৎপর্য

১৯৭১-এর যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খাওয়ায় এবং তার প্রাক্তন পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ছিন্ন হওয়ায় পাকিস্তানকে তার গর্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে এবং ইরানের কাছে তার গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

কিছুদিন আগে ভুট্টো চারদিনের জন্য ইরান সফরে যান। প্রকাশ, তখন দুটি দেশ পাক ও ইরান অধিকৃত বালুচিস্তানে জনগণের মুক্তি আন্দোলন দমনে এক যুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করেন। ভুট্টোকে এক রাজকীয় ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয় এবং সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শাহ্ পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ইরান পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীনতা-আন্দোলন বরদাস্ত করবে না, এবং প্রয়োজন হলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। তিনি বলেন, "আমরা পাকিস্তানে কোনরূপ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন উপেক্ষা করব না।" সঙ্গে সঙ্গে কাবুল পাকিস্তানকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় যে পাখতুনদের অধিকার পদদলিত করা হলে আফগানিস্তান তা বরখাস্ত করবে না। কাবুল থেকে বলা হয় যে, পাখতুনদের সংস্কৃতি ও জীবনধারা এই-মহাদেশের অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সত্যকে অস্বীকার করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আফগানিস্তানের কাছে তা বৈধ বলেই গণ্য হবে না। পাখতুনদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকও বুঝতে পারবেন যে ইরানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভুট্টো বালুচিস্তানের জনগণকে দমন করতে ও ক্রীতদাসে পরিণত করতে চান। এটা করা হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হবে তাঁর প্রাতঃরাশ। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'দেশই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে প্রায় সর্বদাই সমর্থন

জানিয়েছে। তাই এই ধরনের গণহত্যায় তারা চোখ বুঁজে থাকতে পারবে না বিশেষ করে ন্যাপনেতা আতাউল্লা খান মঙ্গল যখন জনগণের কাছে আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।[৫৩] পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ইরানের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে সরকারী ভাবে যে কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে তার কঠোর সমালোচনা করে ন্যাপপ্রধান ওয়ালি খান বলেছেন, আমরা যদি সরকারের যুক্তি মেনে নিই, তাহলে সেই যুক্তিই চীন ও আমেরিকাকে আমাদের নির্দেশদানের অধিকার দেবে, কারণ, তারাও আমাদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।[৫৪]

পিণ্ডি-তেহ্‌রান প্রতিরক্ষা চুক্তি

ইরানে ভুট্টোর অবস্থানকালে পাক প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের শাহ্‌ নাকি সেণ্টোর অংশীদার হিসাবে আরও ঘনিষ্ঠ সামরিক ও নৌ সহযোগিতার বিষয়ে এক সমঝোতায় আসেন। মনে হয়, এটা ভারতের প্রতি ভুট্টোর হুঁশিয়ারি এই মর্মে যে নতুন করে যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান আর একা লড়ে মরবে না। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কতকগুলি দেশকে তার পক্ষ নিয়ে লড়তে টেনে আনতে পারবে।

নতুন পাক-ইরান আঁতাতে আমেরিকার খেলা

ইরান-পাকিস্তান সম্পর্কে যে নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত বলে পাকিস্তানের একখানি জনপ্রিয় উর্দু দৈনিক মন্তব্য করেছে। করাচীর জমিয়ত-ই-ইসলামীর উর্দু দৈনিক 'জসরত' ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্‌যোগে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি হবে এবং তাতে ইসলামাবাদ তেহ্‌রানের কাছে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে তথাকথিত "ভারতীয় ও সোভিয়েত প্রভাব" ও কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে চায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, পেণ্টাগনই পরোক্ষভাবে বালুচিস্তান প্রদেশের মাকরান উপকূল গ্রাস করার চেষ্টা করছে, কারণ, আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি নিয়ে ভারতকে ভীতি প্রদর্শনের পক্ষে এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব অনেকখানি।

মার্কিন সমর্থন ছাড়া ইরান ও পাকিস্তান উভয়েই এখন চীনেরও সমর্থন লাভ করেছে। ১৯৭৩ সালের জুনের তৃতীয় সপ্তাহে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর-এ বলা হয় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং-ফি ১৯৭৩-এর ১৭ই জুন পাকিস্তান যাত্রার প্রাক্কালে তেহ্‌রানে যেসব বিবৃতি দেন তাতে মনে হয়

পারস্য উপসাগর ও ভারতীয় উপমহাদেশে তথাকথিত 'সোভিয়েত সম্প্রসারণ-বাদকে' রুখবার জন্য একটি গোপন চীন-ইরান-পাক আঁতাত গড়ে উঠেছে।

পাকিস্তানে ইরানের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ

ইতিমধ্যে সামরিক অংশীদার হিসাবে ইরান পাকিস্তানকে বালুচিস্তানে তিনটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে সাহায্য করছে। বালুচিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ন্যাপনেতা সর্দার আতাউল্ল। খান মঙ্গল বালুচিস্তানে এক জন-সভায় একথা প্রকাশ করে দেন। তিনি বলেন যে ইরানী সামরিক অফি-সারেরা এই উদ্দেশ্যে বালুচিস্তানে স্থান-সমীক্ষা চালাচ্ছে। তিনি ইরানের শাহ্-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে সরাসরি সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আনেন।[৫৫] তাছাড়া, বালুচিস্তানে সেন্টোর চারটি ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে, পাক বালুচদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ইরানী সৈন্যরা সক্রিয়ভাবে দমন করছে। প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খান ও আব্দুল ওয়ালি খান সহ পাকিস্তানের কয়েকজন বিরোধী নেতা যে বার বার বালুচিস্তানে ইরানী সৈন্যদের উপস্থিতির নিন্দা করেছেন তা তাৎপর্য-বিহীন নয়। "বিদেশীয়দের" সম্পর্কিত সংবাদ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে এয়ার মার্শাল উক্ত প্রদেশ সফর করে এসে বলেন যে ইরানী বিমান বাহিনীর হেলিকপটারগুলি উক্ত অঞ্চলে কার্য-কলাপ চালাচ্ছে।[৫৬]

প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো নিজেও এইসব ঘটনাবলীর সত্যতা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে পাকিস্তান ও ইরান তাদের যুক্ত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছে।[৫৭]

সীমান্তে পিণ্ডির সৈন্যদের তৎপরতা

ইরানের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পাক যুদ্ধবাজরা ভারতকে তার বিষদাঁত দেখাতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সীমান্তের ওপারে পাক সৈন্যদের তৎপরতার সংবাদ সমর্থন করেন।[৫৮] তাছাড়া সম্প্রতি একটি সীমান্ত সংঘর্ষ হয় এবং তাতে একজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এইরূপ অস্ত্র-আমদানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে দিলশাদ এ আলাভি নামে একজন ভারতীয় মুসলমান লিঙ্ক-এর সম্পাদকের কাছে এক পত্রে লিখেন :

ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। সিমলা-চুক্তির মেজাজ প্রায় অন্তর্হিত। পরাভূত ও ছিন্নাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান আবার যুদ্ধের পথে নেমেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের মধুচন্দ্রিমা

যাপনে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামকে হারাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সুস্পষ্ট কারণে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, তৈল-সম্পদে সমৃদ্ধ ইরানে গেড়ে বসছে। ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ দোস্ত শাহ্ তো মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর দেশের প্রায় গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন। এতে এক উদ্‌বেগ-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং পাকিস্তান আবার তার ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের পছন্দসই পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে উৎসাহিত হয়েছে। এইসব ঘটনাবলী পাকিস্তানে যুদ্ধবাজদের শক্তিশালী করেছে......পাকিস্তানের জন-গণ এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি যে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের নীতি তাদের দেশকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। কুখ্যাত দ্বিজাতিতত্ত্বের চিরদিনের মত সমাধি রচিত হয়েছে বাংলাদেশে এবং এই সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

সর্বশেষে তিনি বলেছেন :

বহিঃশক্তিরা সবদাই গোলযোগের সুযোগ গ্রহণে উদ্‌গ্রীব। তারা যদি ভারতীয় উপমহাদেশে আর একবার যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে তাহলে যে কি ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।[৫৯]

আরবদের কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয়ে দিল্লীর উদ্‌বেগ

প্রতিবেশী ইরাকের সঙ্গে এক সীমান্ত বিরোধের অজুহাত দেখিয়ে পারস্য উপসাগরীয় শেখ রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে ধনী কুয়াইত সম্প্রতি ৫০ কোটি ডলার মূল্যের আধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহারের অসীম লালসার (অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের মুনাফায় তা প্রতিফলিত) কথা যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা ভালই জানেন যে তেল ক্রয়ের জন্য আমেরিকার যে বিপুল পরিমাণ ডলার খরচ হয়ে যাচ্ছে তা পূরণের জন্য আমেরিকা কুয়াইতকে মার্কিন বিমান ও সরঞ্জাম ক্রয়ে প্ররোচিত করছে। আর কুয়াইতের শেখ তাঁর দেশের জনগণের স্বার্থে একটি স্বয়ং-নির্ভর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে আমেরিকার হক ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, হেলিকপটার ও এফ-৮ জেট জঙ্গীবিমান ক্রয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

সেই সঙ্গে সৌদী আরবও আমেরিকার কাছ থেকে তার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বিমান এফ-৮ ফ্যান্টম জেট বোমারু সহ ১০০ কোটি ডলার মূল্যের সমরোপ-করণ ক্রয়ের জন্য আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলে জানা গেছে। সম্ভবতঃ ২৪ খানি এই ধরনের শক্তিশালী বোমারু বিমান সৌদী আরবের কাছে বিক্রয় করা হবে। এতে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে নিষ্মন-

প্রশাসনের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রকাশ, ভারত সরকারও সৌদী আরব ও কুয়াইতের কাছে এই ধরনের শক্তিশালী বিমান বিক্রয়ে ওআশিংটন ও দিল্লী উভয় স্থানেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। ১৯৭২ সালের ৩রা অগস্ট অটোয়ায় কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংও যেসব অস্ত্র-ব্যবসায়ী ইরান, কুয়াইত, সৌদী আরব এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশে 'অতি আধুনিক মারণাস্ত্র' বিক্রয় করছে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। তিনি বলেন: "আমাদের মনে রাখতে হবে……যে (ভারত) মহাসাগরের বিভিন্ন ধমনীতে নতুন করে এক সমরসম্ভার সমাবেশের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ যোগানো হচ্ছে, এবং তাতে ভবিষ্যৎ বিবাদ-বিসম্বাদের সূচনা হতে পারে।" বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন যে 'অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের উদ্‌যোগে ও উৎসাহদানে' যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তাতে শান্তির অথবা উক্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সমৃদ্ধ তৈল-উৎপাদনকারী দেশ ও নগর-রাষ্ট্রগুলির জনগণের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এই 'অস্থির ও বিস্ফোরণোন্মুখ অঞ্চলে' ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অস্ত্র এনে যদি ঢালা হতে থাকে তাহলে স্বাধীনতা ও শান্তি কিরূপে নিরাপদ থাকতে পারে! তিনি আরও বলেন যে অস্ত্র মজুতকরণের ফলেই "উক্ত অঞ্চলে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং ঐ সব দেশের জনগণ ও তাদের প্রতিবেশীদের পক্ষে তার পরিণাম কল্পনাও করা যায় না।"[৬০]

ভারত জানে যে রাওয়ালপিণ্ডি চাইলেই ঐ সব অস্ত্র পাকিস্তানে এসে যেতে পারে এবং সেটাই ভারতের আশঙ্কা।[৬১] পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্র সরাসরি না পেলেও তৃতীয় দেশের মারফত পেতে পারে, এই আশঙ্কাতেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে মৌখিক অভিযোগ জানানো হয়।[৬২]

ইরান, পাকিস্তান ও প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাষ্ট্রগুলিকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে ১৯৭৩ সালের ৭ই জুন দিল্লী রাজ্য শান্তি ও সংহতি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তারাই হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের সবচেয়ে বড় শত্রু।" তিনি আরও বলেন যে পাকিস্তান, ইরান ও প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাষ্ট্রগুলিতে যতদিন মার্কিন অস্ত্র আসতে থাকবে ততদিন শান্তি আসতে পারে না।[৬৩]

আমেরিকার জনগণকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ওআশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস ভারতের এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে কুয়াইতের মত তৃতীয় দেশগুলির মারফত পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র প্রেরিত হলে বিপদ দেখা দেবে এবং সেইজন্য ভারতে গভীর উদ্‌বেগের সঞ্চার হয়েছে। উক্ত মহল বলেন যে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে অনুরূপ আশ্বাস দেওয়া সত্বেও মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানে অন্যদেশ মারফত পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মচারী বলেন: "এটা আমাদের পক্ষে গভীর বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিল, পাকিস্তানের হয়েছিল সুবিধা। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন অস্ত্র যদি তৃতীয় দেশগুলির মারফত পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে তাহলে তাতে শুধু ভারত-বিরোধী চরমপন্থীদেরই শক্তিশালী করা হবে না, গত বছর সিমলায় যে মীমাংসা-প্রচেষ্টা শুরু হয় তা আরও বিলম্বিত হবে।"[৬৪]

১৯৭৩ সালের ১৯শে মে লণ্ডন থেকে 'হিন্দু'র সংবাদদাতা লেখেন, "পশ্চিম এশিয়ায় সম্প্রতি যে রণকৌশলগত ও সামরিক আলোচনা চলছে তাতে উক্ত অঞ্চলের সামরিক শক্তির স্বাভাবিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে পারে এবং তার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সংকটের সৃষ্টি হতে পারে।"[৬৫]

১৯৭৩ সালের ১৫ই জুন সরকারীভাবে যুগোস্লেভিয়া সফরের সময় বেলগ্রেডে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি 'উদ্‌বেগজনক অঞ্চলে' পরিণত হোক ভারত তা চায় না। বাইরের অস্ত্র যদি ক্রমাগত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমদানি করা হতে থাকে তাহলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা বা তা রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।[৬৬]

ভুট্টো এখন আশা করছেন, শাহ-এর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনে, সৌদী আরবের প্রচুর অর্থসম্পদ ও ঐস্লামিক প্রীতির সুযোগ নিয়ে এবং চীনের রাজনৈতিক সমর্থন ও অস্ত্র সাহায্যে তিনি পাকিস্তানকে আবার সামরিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবেন। এই সংকটজনক সময়ে এই ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে ভারত-সোভিয়েত চুক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

সেণ্টো থেকে বিপদ

সেণ্টোর অস্তিত্বও ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে সমান বিপজ্জনক। কারণ, অতীতে এই চুক্তি-সংস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সমরপ্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে, আর ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র

পাকিস্তানে যোগান দিয়েছে। একমাত্র ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলেই ভারতের বিরুদ্ধে সেণ্টোর জঘন্য চক্রান্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে সেণ্টোর সেক্রেটারি-জেনারেল মিঃ নাসির আসারের রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রদত্ত এক বিবৃতি। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলের শেষার্ধে সেণ্টোর রাজধানীগুলি সফরের কর্মসূচী অনুযায়ী মিঃ নাসির আসার পাঁচদিনের জন্য পাকিস্তানে আসেন। ঐ সময় রাওয়াল-পিণ্ডিতে এক বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে সেণ্টোকে সজাগ থাকতে হবে।"[৬৭]

সেণ্টো রাজতন্ত্র ও জনগণের শত্রু সামন্ততান্ত্রিক শাসনচক্রকে আগলে রাখার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এরা শুধু জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে চূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টাই করেনি, জনগণের সংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নেরও কুৎসা রটনা করেছে।[৬৮]

১৯৭৩ সালের ১১ই জুন তেহরানে সেণ্টোর মন্ত্রী-পরিষদের বৈঠকে অভিযোগ তোলা হয় যে ভারত ও ইরাকের সঙ্গে সোভিয়েতের স্বাক্ষরিত চুক্তি "ঐ অঞ্চলের সদস্য দেশগুলির কাছে এক ভীষণ বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।"[৬৯] এক প্রশ্নের উত্তরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আলি খালাতবারি বলেন যে সেণ্টোর বৈঠকে ভারত ও ইরাকের সঙ্গে সোভিয়েতের সামরিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে 'এই বিপদ মোকাবিলা করার পদ্ধতি' সম্পর্কেও সেণ্টো আলোচনা করেছে।[৭০]

১৯৭৩ সালের ১০ই জুন তেহ্‌রানে সেণ্টোর এক বৈঠকে পিণ্ডি পীড়া-পীড়ি করেছিল (পাক) যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নে ভারতের 'তীব্র নিন্দা' করা হোক, কিন্তু অন্যান্য দেশ পিণ্ডির স্বরের প্রতিধ্বনি করতে অস্বীকার করে। এতে চুক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চূড়ান্ত ইস্তাহারের বয়ান নিয়ে দু'ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে বিতণ্ডা চলে এবং শেষ পর্যন্ত পাক পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মিঃ আজিজ আমেদকে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নের মৃদু উল্লেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—এই আশা ব্যক্ত করা হয় ইস্তাহারে এবং তাও মেনে নিতে হয় আজিজ আমেদকে।[৭১] পাকিস্তান সেণ্টোর সমর্থন না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করে।

পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় অনেক নেতাই সেণ্টোর সঙ্গে পাকিস্তানের

গাঁটছড়া বেঁধে রাখার তীব্র নিন্দা করেছেন। ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুন পেশোয়ারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাতীয় আওয়ামী দলের সভাপতি খান আব্দুল ওয়ালি খান কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থায় (সেণ্টো) পাকিস্তানের সক্রিয় অংশ গ্রহণের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে বৃহৎ শক্তিবর্গ সারা দুনিয়ায় তাদের রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহারের চেষ্টা করছে।[৭২]

প্রাভদায় পাক নিরাপত্তা পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা

পাকিস্তানের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা সেণ্টোর ওপর নির্ভর করে এবং চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত ও পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক বিস্ময়কর প্রস্তাব করায় ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র 'প্রাভদা'য় তার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

সোভিয়েত পত্রিকায় বলা হয় যে এই প্রস্তাবের পেছনে পিকিং-এর হাত রয়েছে। প্রাভদায় আরও অভিযোগ করা হয় যে এশিয়ায় সত্যিকারের যৌথ নিরাপত্তার জন্য মস্কো যে প্রস্তাব দিয়েছে পিকিং তাকে বানচাল করার চেষ্টা করছে ঠিক যেভাবে ইওরোপে উত্তেজনা-প্রশমনের চেষ্টায় সে বাধা দিয়েছিল নীতিবিগর্হিতভাবে 'নাটো' ও কমন মার্কেটকে সমর্থন করে।

পাকিস্তানী সাপ্তাহিক 'কম্ব্যাট'-এ প্রকাশ এই প্রস্তাবের নিন্দা করে প্রাভদার বিশিষ্ট ভাষ্যকার ভিক্টর মায়েভ্স্কি উক্ত সাপ্তাহিকখানির কাছে শুধু প্রশ্ন তুলেছেন, এই প্রস্তাবটি তাদের নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত, না অপর কারও কাছ থেকে ধার করা?

ভাষ্যকারের মন্তব্যের ধারা, পাকিস্তান ও ইরান থেকে শুরু করে বল্কান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দেশগুলির দিকে চীনের কূটনৈতিক অভিযান সম্পর্কে তৎকালীন সোভিয়েত রচনাবলী এবং তেহ্রানে সেণ্টোর বৈঠকে 'সোভিয়েত বিপদ' সম্পর্কে আলোচনায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং-ফি'র সমর্থনসূচক বিবৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এই প্রস্তাবের উৎসাহদাতা চীন।

প্রাভদার ভাষ্যকার বলেছেন যে, এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত যে পরিকল্পনা দিয়েছে পাক পত্রিকাখানিতে তার ভবিষ্যৎ পরিণামের এক ভয়ঙ্কর চিত্র দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে এর ফলে সমগ্র ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত শক্তি সম্প্রসারিত হবে, পারস্য উপসাগরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি তার নিয়ন্ত্রণে আসবে আর আরব এলাকার তেলও দখল করে নেবে তারা। দারুণ শ্লেষের সঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন যে সাপ্তাহিক-

খানিতে এই কাল্পনিক বিপদ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার কথা যত না বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে চীনের ভবিষ্যৎ ভেবে। তাতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে চীন অসহায়ভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং পশ্চিমের সঙ্গে তার যোগাযোগের সমুদ্র ও বিমান পথও ছিন্ন হবে।

মায়েভ্স্কি পাক পত্রিকাখানিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে সকল রাষ্ট্রের, বিশেষ করে চীনের সমান মর্যাদায় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, আরও এই কারণে যে চীন নিজেই এই ধরনের প্রস্তাব তুলেছিল।

তিনি সোভিয়েতের যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাবের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থনের উল্লেখ করে বলেন যে এই প্রস্তাবটি সামরিক জোট গঠনের নীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি আরও বলেন, "এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে সিয়াটো, সেণ্টো ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জোটের স্থান ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।"[৭৩]

১। হ্যানস জে. মর্গেনথাউ, 'পলিটিক্স অ্যামং নেশন্স' (নিউইয়র্ক, অ্যালফ্রেড এ. নফ, চতুর্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ১৬১।

২। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর কার্যকালে বিলম্বে হলেও বুঝতে পেরেছিলেন যে সি আই এ, জয়েণ্ট চীফ অব্ স্টাফ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ও পররাষ্ট্র বিভাগ—এদের সকলেরই আমেরিকার বিরাট অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ রয়েছে, তাই এদের পরামর্শমত পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে পরিচালিত হওয়া অবমাননাকর এবং বিপদের আশঙ্কাপূর্ণ। ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ব্যর্থ দুঃসাহসিক অভিযানে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মে। তাই তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের শেষভাগে ১৯৬১ সালের ১৭ই জানুআরি তিনি তাঁর বিদায়ভাষণে নিম্নোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, যাতে অবশ্য সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রভুরা কোন আমলই দেন না:

সরকারের কাউন্সিলগুলিতে সামরিক-শিল্প সমাহারের অবাঞ্ছিত প্রভাবসৃষ্টি আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে, তা প্রার্থিত বা অপ্রার্থিত যাই হোক না কেন। অস্থানে ন্যস্ত ক্ষমতার বিপজ্জনক

উত্থানের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা থাকবেও। আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধারা এই জোটের চাপে বিপন্ন হয়ে পড়বে তা আমরা কখনই হতে দেব না। একমাত্র সতর্ক ও ওয়াকিবহাল নাগরিকরাই আমাদের প্রতিরক্ষার উচ্চস্তরের শিল্প ও সামরিক যন্ত্রকে আমাদের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করতে বাধ্য করতে পারে, যাতে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা উন্নত ও স্বাধীনতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

৩। ১৯৬৩ সালের ১০ই জুন ওআশিংটনে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে প্রারম্ভিক ভাষণে জন এফ. কেনেডি পররাষ্ট্রনীতি ব্যাপকভাবে ঢেলে সাজা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন :

কি ধরনের শান্তি আমি চাই এবং আপনারাই বা কি ধরনের শান্তি কামনা করেন? আমেরিকার সমরাস্ত্রের জোরে সারা বিশ্বে আমেরিকার প্রভুত্ব তথা শান্তি চাপিয়ে দেওয়া নয়। কবরের শান্তি নয় বা ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নয়। আমি প্রকৃত শান্তির কথা বলছি—যে ধরনের শান্তি পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন বেঁচে থাকার উপযুক্ত করে তোলে—যে ধরনের শান্তিতে মানুষ ও রাষ্ট্রগুলি উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য আশা রাখতে ও এক উন্নত ধরনের জীবন গড়ে তুলতে পারে।·······কোন সরকার বা কোন সমাজব্যবস্থা এমন অসৎ নয় যে তাদের জনগণের মধ্যে গুণের অভাব রয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে। [কম্যুনিজ্‌ম-এর প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও] আমরা এখনও রাশিয়ার জনগণকে বিজ্ঞান ও মহাকাশ, অর্থনৈতিক ও শিল্পের উন্নয়ন, সংস্কৃতি, সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অনেক কীর্তির জন্য অভিবাদন জানাতে পারি।

৪। আরও পর্যালোচনার জন্য দেখুন রবার্ট শোগ্যানের 'ইমপ্যাক্ট অব্ ওয়াটারগেট', ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ১১ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৬, স্তম্ভ ৩-৫। লেখক উদ্ধৃত করেছেন মিচিগানের একজন রিপাব্লিকানের মন্তব্য: "ওয়াটারগেট শব্দটি জনগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, যেমন করেছিল 'ওয়াটার্লু'।" [ঐ, স্তম্ভ ৫]

৫। ১৯৭৩ সালের ৪ঠা জুলাই ডেকাটারে (আলাবামা) প্রদত্ত সেনেটর

এডওআর্ড কেনেডির বিবৃতি দেখুন, ইভ্নিং নিউজ: হিন্দুস্থান টাইম্স (নয়াদিল্লী), ৫ই জুলাই, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৮, স্তম্ভ ৩-৪।

৬। নিক্সনের প্রতি আমেরিকানদের ৬৫ শতাংশের আস্থা নেই, তবু তিনি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন—এ থেকেই এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি পলস্টার লুইস হ্যারিস কর্তৃক গৃহীত এক সমীক্ষায় প্রকাশ, আমেরিকার জনগণের মাত্র ২৪ শতাংশ নিক্সনের সরকারী কার্যকলাপ অনুমোদন করেন, আর ৬৫ শতাংশেরই তাঁর প্রতি কোন আস্থা নেই। [দেখুন 'মাদারল্যাণ্ড' (নয়াদিল্লী), ৩০শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ ৭।]

৭। এশিয়ায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দুর্গগুলিকে মদত দিয়ে ডিক্টেটর ও স্বৈরাচারী শাসকদের মদত দেওয়ার আরও পরিচয় পাওয়া যায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাউলের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের আচরণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবতরণের পর পরিচয়পত্র পেশের জন্যই প্রায় একমাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, শ্রীকাউলকে তাঁর পূর্ববর্তী রাষ্ট্রদূত শ্রী এল. কে. ঝার মতই ওআশিংটনে প্রেসিডেণ্টের প্রতীক্ষায় চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছিল, একাধিক কূটনীতিকের পরিচয়পত্র একসঙ্গে পেশের ব্যবস্থা করার সুযোগ-সুবিধা প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কখন জুটবে তার জন্য। ওআশিংটনে পর্যবেক্ষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন, ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় না পেলেও মিঃ নিক্সন চীনা রাষ্ট্রদূত মিঃ হুয়াং চেনকে তাঁর ওআশিংটনে উপস্থিতির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভ্যর্থনা করার সময় পেয়েছিলেন।

[দেখুন টাইম্স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ১৪ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৯, স্তম্ভ ৪-৫] ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাই এক সামাজিক বয়কটের অবস্থায় পড়েছিলেন। 'নিরাপত্তার' নামে অসহিষ্ণুতা ও অবিচারের নীতি অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প কোন দেশ বন্ধু খুঁজে পেতে পারে না এবং বিদেশের জনগণকে প্রভাবিত করতেও পারে না—ইতিহাসের এই বিখ্যাত শিক্ষা গ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকেরা কোন আগ্রহ দেখান নি।

৮। ফ্রেডারিক এল. সুম্যান, 'ইণ্টারন্যাশনাল পলিটিক্স' (নিউইয়র্ক, ম্যাকগ্র বুক কোম্পানি, ১৯৬৯, সপ্তম সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৫৯৪। বিশদ

বিবরণের জন্য দেখুন, 'অ্যান অ্যালায়েন্স অব্ দি মনোপলিজ অ্যাণ্ড দি মিলিটারী—অন দি ইউ এস মিলিটারী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' (মস্কো, নোভাস্তি প্রেস এজেন্সী পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩)।

৯। ঐ, পৃষ্ঠা ৫১৩।

১০। কে. আর. মালকানি, 'বিওয়ার অব্ দি শাহ্', মাদারল্যাণ্ড (নয়া-দিল্লী), জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ ৬।

১১। পাকিস্তানকে পুনরস্ত্রসজ্জিতকরণ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় অনেকদিন আগে—১৯৫৪ সালের মে মাসে পাক-মার্কিন পারস্পরিক সাহায্য ও নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে। এই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র ও সমরোপকরণ সরবরাহ্ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রায় ২০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রসাহায্য দেওয়া হয়। অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবার পর পাকিস্তান তৃতীয় দেশের মারফত ২০ কোটি ডলার মূল্যের সমরোপকরণ সংগ্রহ করে—ইরানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ৯০ খানি জঙ্গী বোমারু বিমান এবং অনেকগুলি প্যাটন ট্যাঙ্ক। [দেখুন দেবেন্দ্র কৌশিক ও এম. এ. এস. খানের 'ইউ এস আর্মস ফর পাকিস্তান' (নয়াদিল্লী, পার্সপেক্টিভ পাবলিকেশন্স, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ৪-৫।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খান যখন পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করেন তখন তাঁকে এবং পরে তাঁর স্থলাধিকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ভুট্টো যখন ইয়াহিয়া খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে ক্ষমতা দখল করেন তখন তাঁকেও সর্বাত্মক মার্কিন সমর্থন দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝায় না যে মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহারের বণিক প্রভুদের নিজ দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের কাছে বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের, যথেষ্ট পরিমাণে সিন্ধুর এবং অংশতঃ পাঞ্জাবের জনগণের কাছে ঘৃণ্য এইসব লোকদের প্রতি প্রকৃত কোন দরদ আছে। দিয়েমের মত যখনই এরা মার্কিন কংগ্রেসের অভিপ্রায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখনই ওআশিংটন এদের ক্ষমতার আসন থেকে উৎখাত করে। এদের সমর্থন দিলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আমেরিকার নয়া উপনিবেশবাদীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার

পক্ষে সহায়ক হবে—শুধু এই কথা বিবেচনা করেই এদের সমর্থন দেওয়া হয়। আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত জনগণকে যে কি ভয়ানক মূল্য দিতে হয় তা তাদের নেতারা একবার ভেবেও দেখেন না। পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষ একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করেছে এবং ভুট্টোর পদত্যাগ দাবি করেছে। ['ইভনিং নিউজ: হিন্দুস্থান টাইম্স' (নয়াদিল্লী), ৮ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৮, স্তম্ভ ৩-৪ ।]

১২। বিদেশ থেকে সমরোপকরণ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটও বেড়ে গেছে। পাকিস্তান ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে প্রতিরক্ষায় পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ২৫ শতাংশ বেশী ব্যয় করবে। অর্থমন্ত্রী মিঃ মুবাসির হাসান ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদে পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট পেশ করে বলেন, প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪২৩ কোটি টাকা—১৯৭২-৭৩-এর বরাদ্দ অপেক্ষা ৮৩ কোটি টাকা বেশী। ['সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড' (নয়াদিল্লী), ১০ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ২ ।]

১৩। 'মাদারল্যাণ্ড' (নয়াদিল্লী), ৭ই জুলাই, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৬-৭ । ১৯৭৩ সালের ৭ই জুলাই রাওয়ালপিণ্ডিতে 'ওআশিংটন পোস্ট'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো (তাঁর বাতিল হয়ে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে) ক্রুদ্ধভাবে হম্বিতম্বি করে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দেন, "সে যেন মনে না করে যে পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করবে।" তিনি বলেন, "সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ ভারত করেছে বাংলার জ্বলন্ত চুল্লীতে তার অঙ্গুলি স্থাপন করে। ঢাকার পতন হচ্ছে ভারতের পতনের সূচনা।" ওআশিংটন পোস্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোগল হানাদারেরা বার বার যখন এদেশে এসে হিন্দু জনগণের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেত অতীত ইতিহাসের সেই সময়কার কথা উল্লেখ করে ভুট্টো হুমকি দেন, "উত্তরের পর্বতমালার ওপার থেকে দিল্লীর সমতলে এসে আক্রমণ চালানোর কথা যাঁরা ভুলে যাবেন তাঁরা নিজেদের বিপদই ডেকে আনবেন।" প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় ভারতের 'ক্ষীণ দৃষ্টি'র কথাও বলেন। তিনি 'পরবর্তী যুদ্ধে ভারতকে ধ্বংস করার' সঙ্কল্পও প্রকাশ করেন।

[সাক্ষাৎকারের বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ (নয়াদিল্লী) ৯ই জুলাই, ১৯৭৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৭-৮। আরও দেখুন 'লিঙ্ক' (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২৫ ।]

প্রেসিডেণ্ট ভুট্টোর এই বিবৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত তার কড়া জবাব দেয়। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী পাণ্টা ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান যদি আবার ভারতকে আক্রমণ করে তাহলে সে তার নিজের দেশেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। তখনই সব হিসাব-নিকাশের নিষ্পত্তি করা হবে এবং সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হবে।"

['নব ভারত টাইম্‌স' (নয়াদিল্লী), ৯ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ 8 ।]

১8। "হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন পাকিস্তান", কতকগুলি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রচারিত এক যুক্ত ইস্তাহারের উদ্ধৃত অংশ, 'মার্ক্সিস্ট রিভিউ' (কলকাতা), সপ্তম খণ্ড, ২নং, আগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭০-৭২, ৭৬-৭৭।

১৫। 'প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ৮ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ৩।

১৬। ঐ, 8ঠা জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা 8, স্তম্ভ ৮।

১৭। 'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ২৯শে মে, ১৯৭৩।

১৮। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩।

১৯। ঐ, ১৯শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৬-৮।

২০। 'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ২৯শে মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ 8।

২১। 'দি হিন্দুস্তান টাইমস' (নয়াদিল্লী), ২৫শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ 8।

২২। ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা তো রয়েছেই তাছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী এই মুহূর্তে তা ব্যবহার করছে বালুচিস্তানের জনগণকে নিষ্পেষণ করার কাজে। বস্তুতঃ ভুট্টো একই সঙ্গে নরম-গরম দু'রকমই চালিয়ে যাচ্ছেন। বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমতের চাপে তিনি যখন জনপ্রিয় সরকারকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তিনি প্রকৃতই একজন গণতন্ত্রী ও আদর্শবাদীর মতই কাজ করেছিলেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি সামরিক চক্রের চাপের শিকার হন এবং ইরান থেকে অস্ত্র পাচার

করে আনার এক বাজে অজুহাতে জনপ্রিয় সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। কিছুসংখ্যক চরমপন্থী ইরান থেকে অস্ত্র পাচার করে এনেছিল এবং তাতে মঙ্গল সরকারের কোন হাতই ছিল না। বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাক সৈন্যবাহিনীকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁবেদার ছাড়া সমগ্র জনসাধারণেরই প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে জানার পরও মার্কিন সরকার সঠিকভাবে এই সমস্যাটির মীমাংসায় কোন আগ্রহ দেখান নি। ইন্দোচীন ও কম্বোডিয়ায় অসংখ্য অপরাধ অনুষ্ঠানের পর (মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে প্রতি চার জনে একজন উদ্‌বাস্তুতে পরিণত হয়েছে) পাক প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর জেনারেলদের একথা বলার মত মনোবল মার্কিন সরকারের গড়ে ওঠেনি যে বালুচিস্তানে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে মিটমাট করা। তার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে সমর-সম্ভারের সমাবেশ করে বালুচিস্তানে গণতন্ত্রকে তার জন্ম-লগ্নেই গলা টিপে মারার জন্য যা-কিছু করার তা সবই করেছে। মারিরি ও মঙ্গল এই দুই উপজাতীয়দের দমনের জন্য সেখানে চার ডিভিশন সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। [আরও বিবরণের জন্য দেখুন 'ইভ্‌নিং নিউজ' (নয়াদিল্লী), ৯ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৪-৫ এবং 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি', ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২২।]

২৩। ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তামূলক সাহায্যদান বিষয়ক সহকারী সচিব মিঃ কার্টিস টার সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দেন তাতে দেখা যায় মার্কিন অস্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যাপারে ইরান প্রকৃতপক্ষে এতদিনকার সর্বাধিক ক্রেতা জার্মানীকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই বাস্তব সত্য ইরানের শাহের চেয়ে বেশী কেউ জানেন না। কিছুদিন আগে আমেরিকার 'নিউজ উইক' পত্রিকার একজন সম্পাদকের কাছে তিনি মৃদু হেসে বলেন, "আপনারা আমাদের সব-কিছু দিয়েই সাহায্য করছেন, কোন বাদ-বিচার নেই।" তাঁর বিবৃতির শেষাংশ কিছুটা অতিরঞ্জিত বটে তবে এর মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। আমেরিকার সামরিক-শিল্প

সমাহারের প্রভুরা নিঃসন্দেহে সর্বদাই সেই সব উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের সঙ্গে কারবার করা পছন্দ করেছে যাদের স্নায়ুতন্ত্র গণতন্ত্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সজাগ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের নতুন নতুন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমেরিকার কার্যকলাপে তা সুস্পষ্ট। তাছাড়া সিগম্যান রী, আয়ুব, ইয়াহিয়া, দিয়েম বা শ্যামের স্বৈরাচারী শাসকদের মত অবস্থা ইরানের শাহের নয়, তাঁর অতিরিক্ত গুণ আছে—প্রয়োজনীয় অস্ত্রের জন্য তাঁর কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা তাঁর আছে। সি আই এ'র তত্ত্বাবধানে যে শাসন-পরিচালন ব্যবস্থার সূচনা হচ্ছে, হোয়াইট হাউস ও পেণ্টাগন নোংরা কূটখেলার বিভাগের লোকদের দ্বারা গোপনে তাকে তার সহজাত শক্তি বা প্রকৃত প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বড় আকারের সামরিক শক্তিতে পরিণত করছে, এটা ভাবতেও অবাক লাগে। ইন্দার মালহোত্রা লিখেছেন, 'একটি বিষয়ে যেন ভুল না হয়—ইরানের তৈল-সম্পদ, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং শাসক হিসাবে শাহ্-এর নৈপুণ্য যতই থাক না কেন, ইরান আজ যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে তা সংগ্রহ করার আশাও সে কখনও করতে পারত না।'

[ইন্দার মালহোত্রা, 'ইরান আর্ম্স—এগেন্স্ট হুম', ইলাস্ট্রেটেড উইকলি (বম্বে), ২২শে জুলাই, ১৯৭৩, ৯৪তম খণ্ড, ২৯নং, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ১-২।]

২৪। শাহ্-এর চক্রান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মার্ভিন জোভিসের 'দি পলিটিক্যাল এলিট অব্ ইরান' (প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ৩৯-৭৯। আরও বিবরণের জন্য দেখুন বাহ্মান নিরুম্যাণ্ডের 'ইরান—দি নিউ ইম্পিরিয়ালইজ্ম ইন অ্যাকৃশন' (নিউইয়র্ক, মান্থ্লি রিভিউ প্রেস, ১৯৬৯), পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।

আরও লক্ষণীয় যে সম্প্রতি শাহ্ পশ্চিম জার্মানী সফরে গেলে সেখানে ইরানী ছাত্রেরা এবং স্থানীয় প্রগতিশীল ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, যা অতিথি ও অতিথি-অভ্যর্থনাকারী দু'পক্ষকেই হতবুদ্ধি করে দেয়।

২৫। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইন্দার মালহোত্রার 'ইরান আর্ম্স

—এগেনস্ট হুম', ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি (বম্বে), ২২শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ১।

১৬। বাহ্‌মান নিরুম্যাণ্ড নামে একজন তরুণ ইরানী অধ্যাপক ১৯৬৯ সালে ইরানের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভীকতার সঙ্গে এক আকর্ষণীয় সমীক্ষা চালান। তাতে ইরান সম্পর্কে প্রকৃত সত্য অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদ বলপ্রয়োগ ও প্রতারণা দুই-এর সাহায্যে তাদের এই খাতক দেশের ওপর কিভাবে প্রভুত্ব করছে এবং তাকে শোষণ করছে তার অনেকখানি তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। গ্রন্থকার লিখেছেন, সাহায্যদানের ছলে এদের শোষণের নীতি অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশেষ করে ইরানের ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর আন্তর্জাতিক সংস্থাটি (মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত) ইরানের তেল থেকে প্রায় ২৫ কোটি ডলারের মত মুনাফা লুটছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্পোন্নত দেশ তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ দান করছে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। গ্রন্থকার তাই প্রশ্ন তুলেছেন, সামরিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যার দিক থেকে উন্নততর দেশগুলি কর্তৃক যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব নিয়মিতভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে সে দেশ কিভাবে উন্নত হয়ে উঠতে পারে ?

[বাহ্‌মান নিরুম্যাণ্ড, 'ইরান : দি নিউ ইম্পিরিয়ালইজ্‌ম ইন অ্যাক্‌শন' (নিউইয়র্ক, মান্থ্‌লি রিভিউ প্রেস, ১৯৬৯), পৃষ্ঠা ১৩।]

মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের চরিত্র আরও উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি বারট্র্যাণ্ড রাসেলের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন : 'পশ্চিমীরা 'স্বাধীন বিশ্ব' বলতে কি বোঝে তা অনুধাবনের জন্য আমি ইরানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে বলছি······আমি আশা করি পশ্চিমী দুনিয়ার নাগরিকরা এ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, কেন তাঁদের প্রদত্ত করের অর্থ ও সৈন্যবাহিনী সারা বিশ্বে অত্যাচার ও দুর্নীতিকে সমর্থনের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে······যখন জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটবে তখন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের 'স্বাধীনতা' রক্ষা করবে যেমন করেছিল তারা ভিয়েতনামে বিদ্রোহ দমনের জন্য অসংখ্য প্রাণহানি ঘটিয়ে ?' [ঐ, পৃষ্ঠা ৯]

এই গ্রন্থে ক্রমবর্ধমান জাতীয় ও সামাজিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে, অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন ও অবিচারে যে বাইরে থেকে মদত যোগানো হচ্ছে তাও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিকতার জের যে কিরূপ চলছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে লেখক অন্যান্য অনেকের মতই অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সম্পদ দোহন, রাজনৈতিক সংস্থাগুলি দখল ও সেগুলির দুর্নীতি, কর-কাঠামোতে কারসাজি, স্থানীয় শাসক গোষ্ঠীগুলির সম্মিলিত চক্রান্ত, অর্থনীতির বিকৃতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার ও সন্ত্রাসসৃষ্টি, সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে মানুষের মনোবলকে ধ্বংস করা যা আজ ইরানের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে—এই সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। [ঐ, পৃষ্ঠা ৪]

ধনিকগোষ্ঠীর সম্পদ ও মুনাফা, মার্কিন সামরিক সাহায্য, কূটনৈতিক সার্ভিসের অপব্যবহার ও সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী মোতায়েন করার দিকে লক্ষ্য রেখে মার্কিন সংস্থাগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তাদের নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। [ঐ, পৃষ্ঠা ৪-৫]

২৭। ইরান সম্পর্কে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, সেখানে সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কি ভয়ানক ব্যবধান। জনসাধারণকে সেখানে দমিত করে রাখা হয়েছে। এটা করা আরও সম্ভব হয়েছে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে। নয়া উপনিবেশবাদীদের খাতকেরা সমাজে সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা এবং সেই সমাজকে যুক্ত করে রাখার একমাত্র শক্তি হিসেবে গড়ে উঠছে এই সেনাবাহিনী। দৈহিক ভীতি প্রদর্শন ও অন্যান্য ধরনের বলপ্রয়োগে সাধারণ মানুষ স্বৈরাচারী শাসনছত্রতলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ফলে অন্য দিকে স্বৈরাচারী ডিক্টেটর, অত্যাচারী রাজা-মহারাজার সৃষ্টি হয়েছে যাদের অধিকাংশই ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছে ব্যাপক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

এইসব স্বৈরাচারী শাসক, ধনিক সম্প্রদায়, মোল্লা গোষ্ঠী ও পশ্চিমী নয়া উপনিবেশবাদীদের মধ্যে যোগসাজসের লক্ষ্যই হচ্ছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং এই অবস্থার ফলেই ইরানে ধনী ও

দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আরও অনেক বেড়ে গেছে। "রঙ্গালয়ের মত ও জাঁকালো সরকারী ভবনগুলি, বিমান বন্দর, জাতীয় সড়ক ও গর্ব করার মত অন্যান্য প্রকল্পগুলি, যেগুলি থেকে জাতির অগ্রগতি ও খ্যাতির পরিচয় পাওয়ার কথা, আসলে সহস্রগুণ মিথ্যার পরিচয় বহন করে চলেছে"—মন্তব্য করেছেন নিরুম্যাণ্ড ইরানের দৃঢ়মূল অর্থনীতির দুটি বিপরীত চেহারার বর্ণনা প্রসঙ্গে। একে প্রকট করে তুলেছে "অর্ধভুক্ত ছিন্নবসন অসংখ্য ভিক্ষুকের দল……সব বয়সেরই বিকলাঙ্গ ও অন্ধের দল, বিদেশী পথচারীদের কাছে ভিক্ষাই যাদের ভরসা। এই দুঃখ-দৈন্য এখনও এই বিদেশীদের কাছে দৈনন্দিন জীবনের পশ্চাৎপট হয়ে ওঠেনি। ক্যাডিলাক যেমন আছে, তেমনি আছে তার তুলনায় অনেক বেশী ভাঙ্গা গাধার গাড়ি, ভিলাও আছে, তেমনি আছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী কুঁড়ে ঘর, হিলটন হোটেল ও নাইট ক্লাবগুলিতে বিছানো যে কার্পেটগুলি মানুষ মাড়িয়ে চলে সেগুলি বুনেছে দরিদ্র বালক-বালিকারা দৈনিক ১৪ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করে।" (বাহুমান নিরুম্যাণ্ড-এর "ইরান—দি নিউ ইম্পিরিয়ালিজম ইন অ্যাক্‌শন', নং ২৬, পৃষ্ঠা ১৪, ৮৯)

আজও ইরান তেল বিক্রি করে কোটি কোটি ডলার আয় করছে, সেই সঙ্গে বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের শোষণও চলছে সমানে। সমাজে চেতনার ঐক্যই জনগণকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু চেতনার এইরূপ ঐক্য গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে জ্বলন্ত বৈষম্য। এখনও সারা দেশে নিরক্ষরতার হার ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ। "শাহ্, আল্লা, পিতৃভূমি"—এই ধ্যান-ধারণা এখনও সব ব্যারাকে, সব সরকারী দপ্তরে প্রকট। সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের রক্তে ও মাংসে এই প্রতিক্রিয়াশীল 'নীতিজ্ঞান' কিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা উপলব্ধি করতে হলে ইরানী সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করতে হবে। বেকারের সংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তেল থেকে যে আয় হচ্ছে তা জাতীয় উন্নয়নে ব্যয় না করে শাহ্ ও সৈন্য-বাহিনীর জন্য তা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ থেকে মালপত্র আমদানী হচ্ছে, কিন্তু তা শিল্প গড়ে তোলার সরঞ্জাম নয়, আমদানী

হচ্ছে বিলাস দ্রব্য যা অর্থনীতিকে সাহায্য করে না, যা জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে শুধু মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর আনন্দবর্ধন করে। [বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঐ গ্রন্থ দেখুন, পৃষ্ঠা ৯২ ও ১১০].

তাছাড়া, চাষযোগ্য জমির ৮৫ শতাংশ বৃহৎ খামার ও বেসরকারী এস্টেটের অধীন, ১৪ শতাংশ চাষ করে ক্ষুদ্র চাষীরা এবং এক শতাংশ মিশ্র মালিকানাধীন। কৃষির উপর নির্ভরশীল দেড় কোটি মানুষের ৬০ শতাংশের কোন জমিই নেই, ২৩ শতাংশের জমি আছে এক হেক্টরেরও কম, ১০ শতাংশের জমির পরিমাণ এক থেকে তিন হেক্টরের মধ্যে, ৬ শতাংশের জমির পরিমাণ তিন থেকে কুড়ি হেক্টরের মধ্যে এবং কুড়ি হেক্টরের বেশী জমি আছে মাত্র এক শতাংশের। [উলরিক প্ল্যাঙ্ক—"শেয়ার ক্রপিং ইন ইরান" Zeitschri fi fur auslandischa ft, প্রথম খণ্ড, ১নং, অক্টোবর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৫৭]

প্রচুর পরিমাণ জমি রয়েছে শাহ্-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। শাহ্ প্রকৃতই একজন ধনী ব্যক্তি: আফিম বাগিচার একচেটিয়া মালিকানা তাঁরই এবং শুধু তা থেকেই বছর বছর লক্ষ লক্ষ ডলার তাঁর আয় হয়। [মাইকেল প্যারিস, 'ইরান—দি পোট্রেট অব্ এ ইউ এস অ্যালাই', দি মাইনরিটি অব্ ওআন, ডিসেম্বর, ১৯৬২] ইরানের জনগণ এই জলন্ত বৈষম্য মাথা পেতে মেনে নেয়নি। উপযুক্ত সুযোগ যখনই এসেছে তখনই তারা রাজতন্ত্রের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করেছে।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে ১২:জন মার্ক্স্‌বাদী সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও ফিল্ম-মেকারের একটি দল একটি সরকারী অনুষ্ঠানের ফিল্ম তুলতে গিয়ে শাহ্, সম্রাজ্ঞী ফারাহ্ ও যুবরাজ রাজাকে অপহরণ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হলে তাদের গুলি করে বা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। [বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন 'মাদারল্যাণ্ড' (নয়াদিল্লী), ৩রা অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৩]

২৮। ফ্রেডারিক এল. সুম্যান, এন. ৮, পৃঃ ৩৪৫।

২৯। আঙ্কিক হিসাবের জন্য লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশিত 'মিলিটারী ব্যালান্স'-

এর বার্ষিক রিপোর্টগুলি দেখুন। নয়াদিল্লীর ইনষ্টিট্যুট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস কর্তৃক পরিবেশিত আঙ্কিক তথ্যও দেখুন। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, এ বছর ইরানের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচীর জন্য যে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার (২০০ কোটি নয়) ব্যয় করা হবে তা এখন নীরবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। [টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ৩০শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ ৪]। এতে বোঝা যায় যে ইরান প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করছে তার মোট বাজেটের ১১ শতাংশ, যেখানে ভারত করছে ৩½ শতাংশ, চীন ৯ শতাংশ, পাকিস্তান ১০ শতাংশ এবং সারা বিশ্বে গড়পড়তা ৬ শতাংশ। এ থেকে আরও জানা যায় যে ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোকের দেশ ইরান ৫৫ কোটি মানুষের দেশ ভারত অপেক্ষা প্রতিরক্ষা খাতে বেশী ব্যয় করছে।

৩০। আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভ, "কলোসাস অব্ দি অয়েল লেন্‌স" নিউজ উইক, ২১শে মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৪, স্তম্ভ ১।

৩১। আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভ কর্তৃক উদ্ধৃত তথ্য, ঐ গ্রন্থ।

৩২। ঐ।

৩৩। ঐ, স্তম্ভ ২।

৩৪। পারস্য উপসাগরের পশ্চিমাংশে ইরানের বিমান ও নৌ আঘাত হানার কর্তা কমোডোর ফ্রেদোউন শাহানের বিবৃতি দেখুন, নিউজ উইক, ১২ই মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৪, স্তম্ভ ৩।

৩৫। 'নিউজ উইক', ২১শে মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৩৬। বাটুক গাথানি, 'প্লেন্‌স ফর পাকিস্তান ফ্রম ইরান, সৌদী আরাবিয়া', 'দি হিন্দু' (মাদ্রাজ), ২০শে মে, ১৯৭৩।

৩৭। 'দি মিলিটারী ব্যালান্স' ১৯৭২-৭৩ (লণ্ডন, দি ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিট্যুট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, ১৯৭২), পৃঃ ৩১, স্তম্ভ ১।
ইরানের সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত: স্থলসৈন্য—১৬০,০০০, ২টি সাঁজোয়া ডিভিশন, ৫টি পদাতিক ডিভিশন (কয়েকটি যন্ত্র-পুষ্ট), ১টি অন্যনিরপেক্ষ সাঁজোয়া ব্রিগেড, আই এস এ এম ব্যাটেলিয়ান যাদের হাতে আছে হক, ৮ হাস্কি প্রভৃতি; নৌ-বাহিনী—৯০০, বিমান-বাহিনী—২০,০০০, এছাড়া আছে আধা-সামরিক বাহিনীতে ৪০,০০০ যাদের হাতে রয়েছে ১৪ এ বি ২০৬

খানি হেলিকপটার। [ঐ। আরও দেখুন 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি', ১২ই অগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১১]

ভারতের আছে ৮২৬,০০০ সৈন্য, ৫৭০০ ট্যাঙ্ক এবং ৮৪২ খানি জঙ্গী বিমান, আর ইরানের আছে ১৯১,০০০ সৈন্য, ৯২০ খানি ট্যাঙ্ক ও ১৪৫ খানি বিমান। তবে ইরান নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের ২৭৮,০০০ সৈন্য, ৮৫০ খানি ট্যাঙ্ক ও ২৪৮ খানি বিমানের উপর নির্ভর করতে পারবে যদি মিলিত হবার প্রয়োজন দেখাই দেয়।

৩৮ 'প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ২। আরও দেখুন টাইম্স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৪-৫।

১৯৭৩ সালের ২১শে জুলাই নিউইয়র্ক টাইম্স-এ শাহ্-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর সম্পর্কে প্রকাশিত এক সংবাদে ভারত, ইরান ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির এক বিশ্লেষণে বলা হয় যে ভারতের সেনাবাহিনী অপর দু'দেশের বাহিনী অপেক্ষা বৃহত্তর তবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর সমরোপকরণ ইরানী বাহিনীর মত তত উন্নত ধরনের নয়। এফ-৪ ও এফ-১৪ এই দু'ধরনের জঙ্গী বিমানই অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের। উক্ত সংবাদে অবশ্য নিজস্ব অস্ত্র নির্মাণ ও বিমান নির্মাণ শিল্প থাকায় ভারতের সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে ভারতের পরমাণু শক্তি বিভাগ হচ্ছে ভারতের প্রতিরক্ষার চতুর্থ শাখা এবং এর সমর্থনে ওয়েন উইলকক্স-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। [টাইম্স অব্ ইণ্ডিয়ায় (নয়াদিল্লী) উদ্ধৃত, ২৩শে জুলাই ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ ৫।

৩৯। প্যাট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২৭শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ১-২।

৪০। স্টেট্স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ২৭শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৪। শাহ্-এর বিবৃতির প্রতিবাদে অবশ্য 'কমিটি ফর ফ্রি ইরান অ্যাণ্ড দি রিপাব্লিক অব্ ইরান'-এর সাক্ষরযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন ২৫শে জুলাই, ১৯৭৩ ওআশিংটন পোস্টের একপৃষ্ঠার এক-চতুর্থাংশ জুড়ে প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞাপনটিতে স্বাক্ষরতার দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে নিম্নস্থান অধিকারীদের অন্যতম এই দেশটিতে শাহ্-এর 'সিক্রেট পুলিস, তার

ব্যাপক ধরপাকড়, প্রাণহরণ, আইন-অনুমোদিত নির্যাতন, সেন্সর ব্যবস্থা, বর্বর নিপীড়ন এবং সর্বপ্রকার মানবিক স্বাধীনতা হরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৪১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য একটি নতুন ইরান-পাকিস্তান চক্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এই মর্মে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে সহকারী পররাষ্ট্রসচিব কোনথ রাস ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৩ যে বিবৃতি দেন তার বক্তব্য এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৪২। লক্ষণীয় যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ইরানকে অস্ত্র সরবরাহে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে। পক্ষকাল ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন সফরান্তে ১৯৭৩ সালের ২২শে জুলাই ভারতে ফিরে এসে শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে ইরান ও পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ আমদানী হওয়ায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একই রূপ উদ্‌বেগ বোধ করছে। উপরোক্ত দুটি দেশ সফরকালে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে এবং শেষোক্ত দেশটির সঙ্গে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কতকগুলি বিষয়ে সহযোগিতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। পালাম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে শ্রীরাম সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল আঁদ্রেই গ্রেচকোর সঙ্গে 'ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি এবং সাধারণভাবে বিশ্বশান্তি' সম্পর্কে তাঁর যে আলোচনা হয় তার উল্লেখ করেন। ['প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ২-৩]

৪৩। এইরূপ বিরাট সামরিক সাহায্য দানের জন্য আমেরিকানরা যে কৈফিয়ত দিয়েছে তা মোটেই ধোপে টেকে না। আংশিকভাবে এটা ভারতের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে। বস্তুতঃ 'ফস্টার' ডালেসের সময় থেকেই এই অঞ্চলে পেণ্টাগনের নীতি হচ্ছে ভারতের প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করা। পাকিস্তান প্রশংসনীয় ভাবেই আমেরিকার সে প্রয়োজন মিটিয়েছে।

৪৪ 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' (নয়াদিল্লী), ২০শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৩ এবং স্টেট্স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৩।

৪৫ 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ২৯শে মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ ১।

৪৬ কে. পি. এস. মেনন, "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি নিউ অ্যাক্সিস," সাণ্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৬, স্তম্ভ ৭-৮।

* দেখুন কিসিঙ্গারকে চৌ-এর উপদেশ "পাকিস্তানে আমাদের বন্ধুদের ভুলবেন না", ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৩ ইসলামবাদে এক ভোজসভায় কিসিঙ্গার একথা প্রকাশ করে দেন। ['সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড' (নয়া-দিল্লী), ১১ই নভেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫]

৪৭। 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৪। অস্ট্রেলিয়ায় দেশব্যাপী এক জনমত সংগ্রহ অভিযানে "নয়টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নয়জন নেতাকে বিচার করার জন্য ১৯০০ জনের ভোট গ্রহণ করা হয়" এবং তাতে মিঃ নিক্সন "সবচেয়ে ধূর্ত, নির্মম এবং অসৎ" বলে গণ্য হন। ['স্টেট্‌স্‌ম্যান' (নয়াদিল্লী), ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ৪]

৪৮ ২৬শে জুলাই, ১৯৭৩ ওআশিংটনে সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে শাহ্‌ পাকিস্তানের ওপর ভারত আক্রমণ চালিয়েছে বলে ইতিপূর্বে যে মন্তব্য করেছিলেন তারই পুনরুক্তি করেন। ['প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ২৭শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৯, স্তম্ভ ১]

ঐ দিনই ওআশিংটনে সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে তথা-কথিত আক্রমণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দানের আশ্বাস পরোক্ষভাবে আবার ঘোষণা করে শাহ্‌ আরও বলেন: "পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করবে না। পাকিস্তান পার্বত্য অঞ্চলে হঠে আসবে এবং সেখান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকবে।" [প্যাট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২৭শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৯, স্তম্ভ ১]

এই ধরনের বিবৃতির উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে 'ব্লিজক্রিগের' জন্য প্ররোচিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়, একটি বিশেষ কোন মুহূর্তে সামরিক পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন।

৪৯। ইন্দার মালহোত্রা, '২৫নং নোট দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৪, স্তম্ভ ৩। শ্রীমতী

গান্ধীর সঙ্গে ইলাস্ট্রেটেড উইক্লি অব্ ইণ্ডিয়ার (বম্বে) সম্পাদক শ্রীখুসবন্ত সিং-এর সাক্ষাৎকারের বিবরণও দেখুন ঐ পত্রিকায়, ১২ই অগস্ট, ১৯৭৩। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণের একাংশ ১২ই অগস্ট, ১৯৭৩ স্টেট্স্ম্যানে (নয়াদিল্লী) প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ ৮।

৫০। ইরানের শহরগুলিতে গেরিলারা তৎপর বলে প্রকাশ। পুলিস নির্মমভাবে তাদের দমন করছে। প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা এখনও ঘটছে। সংবাদপত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

৫১। পাক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি উদ্ধৃত করে ইভ্নিং নিউজ: হিন্দুস্থান টাইম্স (নয়াদিল্লী), ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ১-২।

৫২। ঐ।

৫৩। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন টাইম্স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩। বালুচিস্তানে পাক অত্যাচার অব্যাহত ভাবে চলেছে। বালুচিস্তানের প্রাক্তন রাজ্যপাল ঘউস বক্স বিজেঞ্জো বলেছেন, চামান থেকে জেওয়ানি (মাকরান উপকূল) পর্যন্ত ৯৬০ মাইল দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে পাক সৈন্যবাহিনী ও ফেডারেল বাহিনীর ইউনিটগুলিকে মোতায়েন করা হয়েছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা কোয়েটায় সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে এইসব ঘটনা থেকে মুখোমুখি সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে "যা আমরা এড়াবার চেষ্টা করছি"—পাকিস্তান প্রেস ইণ্টারন্যাশনাল-এ তাঁর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এখন জানা গেছে যে পাক বিমান বাহিনীর চীফ এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও স্থল বাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খানের সাম্প্রতিক বালুচিস্তান সফরে সহযাত্রী হন।

মিঃ বিজেঞ্জো বালুচিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ঐ প্রদেশে সোভিয়েত অস্ত্র আমদানির ভুয়া প্রচার চালাবার অভিযোগ আনেন।

তিনি বলেন, ওরা একটি অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি—এমনকি তথাকথিত যেসব 'গেরিলা' অস্ত্র সহ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের কাছ থেকেও নয়।

তিনি বলেন, এটা পরিতাপের বিষয় যে দেশব্যাপী মিথ্যা প্রচারকার্যের ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রদেশটি দুনিয়ার

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন যে প্রাদেশিক সরকার ফেডারেল সরকারের সমর্থনে এই প্রদেশে এক সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে এমন একটা মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করছেন যে বালুচিস্তানের জনগণ বিচ্ছিন্নতাকামী।

মিঃ বিজেঞ্জো বলেন যে সর্বদাই নানাভাবে জনগণকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে চরম পন্থা গ্রহণ করে। তিনি বলেন, ন্যাপ বালুচিস্তানে তাদের আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেও বর্তমান অবৈধ ও সংবিধানবিরুদ্ধ ভাবে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার বা অন্য যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ আইন-সম্মত অধিকার এই প্রদেশের জনগণের আছে।

ইসলামী জমিয়ৎ তুলবা নেতা আলি জাফার জামাল বালুচ সম্প্রতি বালুচিস্তান সফর করে এসে লাহোরের উর্দু সাপ্তাহিক লায়াল-ও-নিহার-এ লিখেছেন যে প্রদেশটি এখন চারটি সামরিক ডিভিশনের দখলে রয়েছে এবং মারি উপজাতীয়দের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

তিনি বলেছেন, মেঙ্গল উপজাতীয়দের ওপর সৈন্যদের অত্যাচার দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মনে হয় এই উপজাতীয়দের অনাহারে মারার চক্রান্ত করা হয়েছে।

সৈন্যরা কাউকে এক কিলোগ্রাম গমও উপজাতীয় অঞ্চলে নিয়ে যেতে দেয় না এবং মেঙ্গলদের কাছে কোন জিনিস বিক্রি না করার জন্য লাস বেলায় দোকানদারদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই উপজাতীয়েরা লাস বেলায় আসে তাদের ছাগল, ভেড়া ও পশম-দ্রব্য বিক্রি করার জন্য।

দোকানদারেরা তাদের জিনিসপত্র কিনতে পারে কিন্তু তাদের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করতে পারে না।

১৯৭৩ সালের ২৩শে মে জারি করা এক সামরিক ফরমানে বলা হয়েছে যে, কোন দোকানদার মেঙ্গলদের কাছে একটি দেশলাই বিক্রি করলেও তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

জামাল বালুচ আরও বলেছেন যে সৈন্যবাহিনী মারি উপজাতীয়দের সমস্ত রেশনকার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে, অথচ তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে বলে মিথ্যা প্রচারকার্য চালাচ্ছে।

সর্বোপরি ভুট্টো-বিরোধী বিশিষ্ট নেতাদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে। *

['ইভ্‌নিং নিউজ' (নয়াদিল্লী), ২০শে জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৩-৫]

৫৪। 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভুট্টোশাহীর রেকর্ডও ভাল নয়। এ পর্যন্ত চারবার বাদশা খানের পুত্র এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা ওয়ালি খানকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। সেই জন্য তিনি ভুট্টোকে "হয় বুলেট, নয়তো ব্যালট—এর মধ্যে যে-কোন একটা বেছে নেবার" আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া ওয়ালি খানের পার্টি নিষিদ্ধ করার হুমকিও যখন-তখন দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ৮৫ বৎসর বয়স্ক বাদশা খানকেও কোয়েটা যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হয়। [বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন 'মাদারল্যাণ্ড' (নয়াদিল্লী), ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৮ এবং ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৫-৬]

* খুসবন্ত সিং-এর সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেখুন, 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' (বম্বে), ১২ই অগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০-১৪।

৫৫। দেখুন 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩ এবং 'প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ২০শে মে, ১৯৭৩।

৫৬। 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), ৭ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৪-৫।

৫৬ (ক)। 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' (নয়াদিল্লী), ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৩।

৫৭। 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া', ৫৬নং নোট দ্রষ্টব্য।

৫৮। 'প্যাট্রিয়ট' (নয়াদিল্লী), ৪ঠা জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৭।

৫৯। 'লিঙ্ক' (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২, স্তম্ভ ১-২।

৬০। 'সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড', নয়াদিল্লী, ৫ই অগস্ট, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৬-৭।

৬১। 'হিন্দু'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা মিঃ বাটুক গাথানি ১৯৭৩ সালের

১৯শে মে তাঁর প্রেরিত সংবাদে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির রিপোর্ট উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে ইরান, সৌদী আরব, ফ্রান্স ও চীন থেকে পাকিস্তান বিভিন্ন ধরনের বিমান আমদানি করে তার বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করছে। পাকিস্তান সরকার এইসব দেশের সরকারগুলির সঙ্গে আমেরিকায় নির্মিত এফ-৫ বিমান থেকে শুরু করে চীনে নির্মিত টি ইউ ১৬ ধরনের বিমান পর্যন্ত সরবরাহের এক চুক্তি নীতিগতভাবে সম্পাদন করেছে। সংবাদদাতা আরও লিখেছেন যে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩০০ ফ্যাণ্টম বিমান সংগ্রহের পর পাকিস্তানকে দুই স্কোয়াড্রন স্যাবার ও এফ-৫ বিমান সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। ভুট্টোর সাম্প্রতিক ইরান সফরের সময় এই বিমান সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সৌদী আরবও ফ্রান্সের কাছ থেকে মিরাজ বিমান সংগ্রহের পর পাকিস্তানকে অনুরূপ ধরনের বিমান (সংখ্যা জানা যায়নি) ও স্টারফাইটার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আরও প্রকাশ, পাকিস্তান ফ্রান্সের সঙ্গে ১০০ খানি মিরাজ বিমান ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা চালাচ্ছে।

['দি হিন্দু' (মাদ্রাজ), ২০শে মে, ১৯৭৩। আরও দেখুন 'ইভ্‌নিং নিউজ' (নয়াদিল্লী), ২রা জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ ২-৩]

৬২। 'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' (নয়াদিল্লী), জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১২, স্তম্ভ ৩-৪। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'দি গাল্‌ফ পলিটিক্‌স অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটি দেখুন, 'দি হিন্দু' (মাদ্রাজ), ২২শে মে, ১৯৭৩।

৬৩। প্যাট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ৮ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ২।

৬৪। 'দি ইভ্‌নিং নিউজ : হিন্দুস্তান টাইম্‌স' (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৮, স্তম্ভ ৩।

৬৫। 'দি হিন্দু' (মাদ্রাজ), ২০শে মে, ১৯৭৩।

৬৬। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ২।

৬৭। 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' (নয়াদিল্লী), ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩।

৬৮। ১৯৭৩ সালের ১১ই জুন তেহ্‌রানে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেণ্টোর সেক্রেটারি জেনারেল ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান নাশকতা-মূলক কার্যকলাপ সদস্য রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ভীষণ বিপদ হয়ে দেখা

দিচ্ছে। তাঁরা তুরস্ক, ইরান ও বালুচিস্তানে বামপন্থী গেরিলাদের তৎপরতার কথা উল্লেখ করছিলেন, ঐ সব অঞ্চলে সোভিয়েত ও চীনা অস্ত্রশস্ত্র ও মেশিনগান নাকি 'খেলনার মত' বিক্রি হচ্ছে। ['হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ১২ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭, স্তম্ভ ৩।]

৬৯। ঐ।

৭০। ঐ, স্তম্ভ ৮।

৭১। 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' (নয়াদিল্লী), ১২ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১, স্তম্ভ ৫।

৭২। 'ইভ্‌নিং নিউজ: হিন্দুস্তান টাইম্‌স' (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ ৪।

৭৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এন. এম. ঘাটাটে সম্পাদিত 'ইন্দো-সোভিয়েত ট্রিটি: রিঅ্যাক্‌শন্‌স অ্যাণ্ড রিফ্লেক্‌শন্‌স' (নয়াদিল্লী, দীন-দয়াল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৮।

জাতীয় নিরাপত্তা

(II) উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বিপদ

পাকিস্তান ও আমেরিকার সঙ্গে চীনের দহরম-মহরম

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এক আঁতাত ও জোট পশ্চিম প্রান্ত থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিদ্বেষ বিচিত্র শয্যাসঙ্গীর জন্ম দেয়। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, যে-কোন ধরনের ভারত-পাক দ্বন্দ্বেই আমেরিকা ও চীন থাকে পাকিস্তানের পক্ষে। এটা ইতিহাসের এক তীব্র পরিহাস; তবু এই অতি রোমাঞ্চকর নাটকের মধ্যে দিয়েও একটা নৈতিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। কারণ, এতে একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ভড়ং-এর মুখোশ খুলে গেছে অন্যদিকে তেমনি মাও-এর চীনের বৈপ্লবিক আস্ফালনের স্বরূপও ফাঁস হয়ে পড়েছে। এটা সত্যই ইতিহাসের এক বিচিত্র পরিহাস যে, যে-দেশ নিজেকে দাবি করে মার্ক্সবাদের খাঁটি কর্মকেন্দ্র বলে, যে-দেশ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধগুলোকে মৌখিক সমর্থন জানানোর ব্যাপারে সবচেয়ে সরব, সেই দেশই কিছুকাল আগে ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক চক্রের নির্লজ্জ ও প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল; আর আজ এখন সে সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভুট্টোর স্বৈরতন্ত্রের—যে ভুট্টো বালুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করছে আর ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিষাক্ত নখরে শান দিচ্ছে।

চীনের এই ধরনের সুবিধাবাদী কৌশল শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয় আরও অনেক জায়গাতেই চৈনিক মতাদর্শের ধাপ্পার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে।[১] বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরমাণুশক্তির পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে* চীন অদ্ভুতভাবে একদিকে সোভিয়েতকে 'শোধনবাদী' বলে নিন্দা করে চলেছে আর অন্যদিকে চলেছে তার সাম্রাজ্যবাদী আর পুঁজিবাদীদের মন জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা। মাও-এর রাজত্বে চলছে এখন প্রেমের পিংপং খেলা। সম্ভবতঃ মার্কিন-চীন অস্ত্রসাহায্যে বলীয়ান হয়েই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর সংক্রান্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খান আবদুল কোয়ায়ুম খান ভারত-বিরোধী অপপ্রচারের নেতৃত্ব দিতে সম্প্রতি করাচীতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বলেছেন:

দু'বছর আগের চেয়ে পাকিস্তান আজ অনেক বেশী শক্তিধর। ভারতীয়রা

যদি ভাবে যে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেও তারা গিলে ফেলতে পারবে তাহলে তারা দুঃখজনকভাবে ভ্রান্ত। আমরা তৈরী এবং যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে আমরা ভারতকে চিরকাল মনে রাখার মত আঘাত দিতে পারব। এই কথাটা যেন সবাই ভাল করে মনে রাখেন।[২]

চীনের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির যাঁরা নিয়মিত পর্যবেক্ষক তাঁদের কাছে অবশ্য ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, চীনের সম্প্রসারণবাদ, জাতীয়তাবাদী হঠকারিতা এবং বৃহৎ শক্তিসুলভ ডম্ফাইয়ের নীতি[৩] মণ্ডিত হয়েছে অতিবিপ্লবী গালভরা বুলি দিয়ে। তার জাতীয় ডম্ফাই ও ব্যতিক্রমমূলক আচরণে ভারতীয় উপমহাদেশের ভারসাম্য বানচাল হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতি বিঘ্নিত করে চীন যখন বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দেয় এবং তার পরই পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার জন্য দিল অস্ত্রসাহায্য তখন সত্যিই এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয়নি কি? চীনের কথা ও কাজের মধ্যে এই ফারাক-এর মধ্যে আবার প্রতিফলিত হয় তার স্ববিরোধিতার প্রকৃতিটি। চীন প্রকাশ্যে দাবি করে যে, সে কার্ল মার্ক্সের প্রকৃত শিক্ষাকে অনুসরণ করছে কিন্তু কাজের বেলায় সে আন্তর্জাতিকতার বদলে জাতীয়তাবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করছে। উনিশশো চল্লিশের বৈপ্লবিক উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হ'ল সীমাহীন কটূক্তিবর্ষণ আর প্রতিবিপ্লবী উপদলীয় চক্রান্তে। বৈপ্লবিক মতাদর্শে ভেদাভেদ এবং যুদ্ধোন্মাদনা এবং সম্প্রসারণবাদের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বস্ততাই এই স্ববিরোধিতার উৎস। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তারই শিকার হয়েছে। এ ধরনের ঘটনাস্রোতে যে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে তার শত্রুর সাথে মৈত্রী করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে; অর্থাৎ সেই চাণক্যনীতি: 'শত্রুর শত্রু তোমার মিত্র।' এই ধরনের ক্ষমতার রাজনীতির জুয়াখেলা যদি শান্তি, সমাজতন্ত্র, জোটনিরপেক্ষতা এবং ভারতের অর্থনীতিকে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক পথে পরিচালনা করার বীরত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী প্রগতিশীলরা সন্দেহের চোখে দেখেন তাতেও চীনের কিছু যায় আসে না। সোভিয়েত ও ভারতের প্রতি আমেরিকা শত্রুভাবাপন্ন। চীনও তাই। দু'পক্ষের এই মতের মিল থাকার ফলে চীন সর্বান্তঃকরণে আমেরিকার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আর নিক্সন-প্রশাসনের নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যর্থ-অভিযানের নীরব সহযোগী হ'তে সম্মত হল। এ পর্যন্ত

পাওয়া প্রমাণ থেকে বোঝা গেছে চীনের এই নীতির আসল উদ্দেশ্য ভারত ও সোভিয়েতের পক্ষে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। এই সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে যদি চীন-সীমান্তের অপর পারে মাওয়ের মার্ক্সীয় মতাদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠ শক্তিগুলি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণে দুর্বলও হয়ে পড়ে তাতে চীনের কিছুই আসে যায় না। ইতিপূর্বে পকিস্তানকে সে সাহায্য করার ফলে বাংলাদেশে অত্যাচারের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, আবার পাক-জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে পাকিস্তানকে সে সাহায্য করছে।[৪]

চীন ভারতের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে খর্ব করতে তো চাইছেই, সেই সঙ্গে পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যও উসকানি দিচ্ছে। পাকিস্তান নিজেই ভুলে যাচ্ছে পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক ভূভাগ এবং অর্ধেকেরও বেশী লোক নিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর ভারতের সমকক্ষতা অর্জনের রঙিন স্বপ্ন দেখবার দিন তার শেষ হয়ে গেছে। ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যে ঘোষণা ভুট্টো করেছিলেন তা আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে এবং তাঁর দেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবার ছকে একটি বোড়েতে পরিণত করেছে। আর সেই ছকটি ঘিরে বসে আছে আমেরিকা, চীন ও ইরান।

সামান্য এক চীন-ভারত সংঘর্ষের ফলে পঞ্চশীল নীতির প্রবক্তা ভারত চীনের কাছে সুবাসিত পুষ্প থেকে বিষাক্ত আগাছায় পরিণত হল। অন্যদিকে এই সেদিন পর্যন্ত যে পাকিস্তান মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের হাতিয়ার এবং আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি সরববাহকারী হিসেবে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত এবং নির্মূলযোগ্য আগাছা ব'লে নিন্দিত হত, হঠাৎ পিকিংয়ের মানদারিনরা তাকে সুরভিত পুষ্প রূপে বুকে তুলে নিল, আর অবিরাম ভাবে তাকে তোষণ করতে লাগল। ভারতকে প্রকৃত বা সম্ভাব্য শত্রুর সারিতে নামিয়ে এনে চীন (কে. পি. এস. মেননের ভাষায়) "পাকিস্তানের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি শুরু করল আর তারপরই শুরু হল চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে এক শত্রুতার (ভারতের বিরুদ্ধে) আঁতাত।" অন্ততঃ পক্ষে সাম্প্রতিক চীন-মার্কিন সখ্যতাও কিছুটা শত্রুতার আঁতাত তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৫]

এই নতুন বিদ্বেষপ্রসূত ডিগবাজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চৈনিক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী চি-ফেঙ-কেই ১৯৭৩ সালের ১৯শে জুন করাচীতে এক ভোজসভায় বলেন —ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা এখনও অশান্ত, এবং তিনি কিছু সম্প্রসারণ-বাদী শক্তিকে (ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের

মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টির চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের অস্থিতিশীল অবস্থাও কিছু সম্প্রসারণবাদী শক্তির কাজকর্মেরই ফল।

তাঁর অভিযোগ হ'ল, এইসব শক্তি এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে আর অন্যদিকে যে-কোন ভাবে ভেতরে ঢুকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলছে।[৬] ঐ অঞ্চলের সমস্যাগুলি সম্পর্কে চীন যে "নীতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর" পরিচয় দিয়েছে তার জন্য ভোজসভার উদ্‌যোক্তা ভুট্টো চৈনিক অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।[৭]

চীন একদিকে মাও সে তুঙয়ের ভাবমূর্তিকে মহাবিপ্লবী রূপে বিদেশে রপ্তানি করার চেষ্টা করে (যা স্ট্যালিনের ব্যক্তি-পূজার পদ্ধতিকেও হার মানিয়ে দেয়) অপরদিকে পাকিস্তানবাসীর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বিকাশের আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য পাক সামরিক দস্যুদের (দেশকে দক্ষিণপন্থার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য যারা মূলতঃ দায়ী) হাতে তুলে দেয় টি-ইউ বোমারু বিমান সহ সর্বপ্রকার সাহায্য।

যুগপৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টাও করা হয়। জাতীয়তাবাদী হঠকারিতার "মিথ্যে আর ক্ষতিকর ধর্মের (আর্নল্ড টয়েনবি) বিধান অনুযায়ী চীন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার প্রতি আনুগত্য বর্জন করে বিশাল জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করল ভারত ও সোভিয়েতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শত্রুতাসাধন ও গুরুতর দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কাজে। যাঁরা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার জন্য লড়াই করেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের কাছে এই ধরনের ডিগবাজি নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক। চীন পাকিস্তানকে প্রশিক্ষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সমেত যে টি-ইউ-১৩ জেট বোমারু বিমান দিয়েছে সেগুলি পাক-বিমান বহরের ক্ষমতা দারুণ বাড়িয়ে দেবে। এই বিমান সরবরাহ ভারতের প্রতিরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উপমহাদেশে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।[৮]

এই অবস্থায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আগের চেয়ে আরও বেশী সুষ্ঠু সহযোগিতা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভারতের নিরাপত্তা ও টিকে থাকার প্রশ্নই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। আর যা-কিছু সবই গৌণ!

সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েতের পালটা জবাব

ভারতও এই সামরিক তৎপরতা দেখে হাত গুটিয়ে বসে নেই। ভারত-সোভিয়েত যৌথ ব্যবস্থাই আগ্রাসনকারীদের যথোপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক মস্কো সফর তাই উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য তিনি কি ধরনের সাজ-সরঞ্জাম চাইতে পারেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে তিনি বলেন যে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে তিনি ভারতের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ এই অঞ্চলে যে জোট গড়ে উঠছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক আলোচনা হবে। আগামী দশকে যে-কোন ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার যথোপযুক্ত মোকাবিলার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলো সম্বন্ধে তিনি খোঁজখবর নেবেন বলেই মনে হয়। ভারত যাতে নিজেই তার সামরিক সরঞ্জাম বানিয়ে নিতে পারে, সেজন্য আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে কৃৎকৌশল বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়। শ্রীজগজীবন রামের মস্কো সফরকালে ১৯৭৩ সালের ১৬ই জুলাই এক যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। ইস্তাহারে বলা হয়—মৈত্রীচুক্তির আলোকে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতাকে আরও সম্প্রসারিত করার বিষয়ে উভয় পক্ষ মত বিনিময় করেন। শ্রীকোসিগিন এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে এবং সামগ্রিকভাবে এশিয়ায় শান্তি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে এসেছে। উভয় পক্ষই এই আস্থা প্রকাশ করেন যে, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাকে যত্নসহকারে টিকিয়ে রাখা ও আরও শক্তিশালী করা উচিত। শোনা গেছে, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেন্টোকে আবার চাঙ্গা করে তোলা এবং তাতে চীনের সমর্থনের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেছেন। এইসব ঘটনা যে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে ভয়ের কারণ, সে সম্পর্কে ভারত তার মনোভাব জানিয়েছে। সিমলা বৈঠকে ভারত-পাক বোঝাপড়ার যে সুর বেজেছিল, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্রেফ হামবড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে তার বিরোধিতা করে।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি ইওরোপের দেশগুলি ভ্রমণকালে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, যুদ্ধবন্দী, পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাঙালী এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী বিহারী (যাঁরা নিজেদের পাক-নাগরিক হিসাবে দাবি করেন) তাঁদের ত্রিপাক্ষিক বিনিময়ের যে প্রস্তাব ভারত-বাংলাদেশ যুক্তভাবে দিয়েছিল তা যাতে পাকিস্তান মেনে না নেয়, তার জন্য চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ওপর

চাপ সৃষ্টি করছে। চীন-মার্কিন দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার এর চেয়ে ভাল সাক্ষ্য আর কিছু নেই। এইভাবে দুই বৃহৎ-শক্তি শান্তির সম্ভাবনাকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ-খেলায় মেতে উঠল। সবরকম সূত্র থেকে বিরাট পরিমাণ অস্ত্রসাহায্য দেবার যে প্রতিশ্রুতি টিক্কা খানকে দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে বোঝাপড়ার ভিত্তিটি ছিল এই যে পাকিস্তান সবসময়ই একটা 'যুদ্ধং দেহী' মনোভাব বজায় রাখবে।[৯]

এর চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়েই বৃহৎ-শক্তিসুলভ দম্ভে উন্মত্ত হয়ে গেছে। এটা কি ইতিহাসের এক পরিহাস নয় যে এশিয়ায় বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীগুলির স্থান পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় "এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বাদ দিয়েই এশিয়ার কথা ভাবছিল আর এখন সে এশিয়াকে বাদ দিয়ে চীনের কথা ভাবছে।"[১০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সর্বাত্মক বিপদ

এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে মার্কিন প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের উদ্দেশ্য শুধু ভারতের কণ্ঠদেশে ইরান-পাক-চীন জোটের ফাঁসের বাঁধন আরও শক্ত করাই নয়, সম্ভব হ'লে তার পেটে বা পৃষ্ঠদেশে আকস্মিক গোপন কায়দার ছুরিকাঘাত করাও। নিয়মিত ভাবেই চলছে সেই চেষ্টা। ভারতে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক গোলযোগ, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে ছাত্র-হাঙ্গামা ইত্যাদির পিছনে যে সি. আই. এ. ও বিদেশী শক্তির হাত ছিল তা জানার জন্য কাউকে রহস্য উপন্যাসের ওপর নির্ভর করতে হবে না। তাদের পরিকল্পনা ছিল ভারতের দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। রাঁচিতে ১৯৭২ সালের ২রা অক্টোবর এক ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারতে সি. আই. এ.'র তৎপর হয়ে ওঠার সংবাদ তাঁর কাছে আছে। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের সতর্ক থাকতে এবং এইসব তৎপরতার মোকাবিলা করতে আহ্বান জানান। তিনি তাঁর দলীয় কর্মীদের বলেন, "এই সংস্থা যে ভারতে সক্রিয় নয়, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের নয়। সি. আই. এ.-কেই প্রমাণ করতে হবে যে সে ভারতে সক্রিয় নয়।"

একই ভাবে সারাভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার গুজরাট শাখার একদিন-ব্যাপী সম্মেলনের উদ্‌বোধন করতে গিয়ে ১৯৭৩-এর ৩রা জুন ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন যে, এশিয়ার জাতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অনুন্নত জাতিগুলির অগ্রগতিকে

ব্যাহত করেছে, জনগণের উচিত এই বিপদ উপলব্ধি করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই ধরনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেরা সংগঠিত হওয়া।[১১] এই একই অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বিশ্বশান্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরমেশচন্দ্র আর একটি স্লোগান যোগ করেন (ইতিমধ্যে যেসব স্লোগান চলছে যেমন—"প্যালেস্টাইন থেকে হাত ওঠাও এবং ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও" ইত্যাদির সঙ্গে)—"ভারত থেকে হাত ওঠাও।" কারণ, তিনি মনে করেন যে সাম্প্রতিককালে এই উপমহাদেশে সি. আই. এ.'র তৎপরতা দারুণ ভাবে বেড়ে গিয়েছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বলেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে নাক-গলানো এবং তা বানচাল করাই হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-রণনীতি। সম্প্রতি-কালে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সি. আই. এ.'র কর্ম-তৎপরতা খুব বেশী ক'রে চোখে পড়ছে। তিনি চান যে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভিন্ন বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও সি. আই. এ.'র তৎপরতার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা হোক। এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তর প্রদেশের সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর সাম্প্রতিক 'বিদ্রোহের' পিছনে সি. আই. এ.'র সমর্থিত 'শয়তানী-শক্তি' ছিল বলে উল্লেখ করেন।[১২]

বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি শান্তিকামী জনগণের স্বার্থে বিশ্বকে সাম্রাজ্য-বাদী কবজা থেকে মুক্ত করার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে একযোগে সংগ্রাম করতে হবে। ভারতীয় জনসাধারণের শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও মৈত্রী। ভারতের প্রয়োজনের মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন একনিষ্ঠভাবে তার পাশে থেকেছে। আর এক শক্তির উৎস হ'ল ভারতের জনগণের ঐতিহ্যময় ঐক্য যা কর্মসূচীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের সকল প্রগতিশীলদের সাধারণ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লড়াই করার সামর্থ্য যোগায়।

ভারত মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান মার্কিনী তৎপরতা

মার্কিন প্রশাসন সর্বত্র তার বাহুবিস্তারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ভারতের পা দুটি বেঁধে ফেলার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসাজস ক'রে মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদীরা ভারত মহাসাগরে বেশকিছু নৌ ও বিমান ঘাঁটি পেয়েছে। তাদের ঐসব ঘাঁটিগুলো রয়েছে গ্যান দ্বীপ, দিয়েগো গার্সিয়া (চ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জে), আসমারা (এরিত্রিয়ার রাজধানী, সুদান ও লোহিত সাগর ঘিরে একেবারে উত্তরতম প্রদেশটি) এবং বাহরীন দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-

পশ্চিম অন্তরীপ এবং ককবার্ন সাউণ্ড, আর ফ্রাসী ঘাঁটিগুলোর কথা নাহয় বাদই গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন দুজনেরই দক্ষিণ আফ্রিকা (বর্ণ-বিদ্বেষের মারাত্মক দুর্গ), মরিশাস, ইথিওপিয়া, মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে রয়েছে সামরিক চুক্তি। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রায়ই ভারত মহাসাগরে তাদের নৌবহরের মহড়া দেয়।[১৩] অতি সাম্প্রতিক লক্ষণগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ যতই কমে আসছে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত টহল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরের বুকের মাঝখানে ব্রিটিশ দ্বীপ দিয়েগো গার্সিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মার্কিন নৌবহরের কয়েকটি ইউনিট ১৯৭১ সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলনের মহড়া দিয়েছে। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব্ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস[১৪] তাঁদের বাৎসরিক পর্যালোচনা—ইণ্ডিয়া ইন ওআর্ল্ড্ স্ট্রাটেজিক এনভিরনমেণ্ট, ভল্যুম ২-এ এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। ঐ বাৎসরিক পর্যালোচনাতেই আরও বলা হয়েছে যে পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানাধীন সেকিল্লেস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাহে দ্বীপে আমেরিকা একটি যোগাযোগ রক্ষার ঘাঁটি স্থাপন করেছে।[১৫] অস্ট্রেলিয়াতে বেলুন উৎক্ষেপণ ঘাঁটি থেকে আরম্ভ ক'রে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত চৌদ্দটি নানান ধরনের ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। ওগুলির মধ্যে প্রধান চারটি রয়েছে উমেরা, পাইন গ্যাপ, অ্যালিস স্প্রিংস ও উত্তর-পশ্চিম অন্তরীপে।[১৬]

এটা মনে রাখা দরকার যে, জাপান, ওকিনাওয়া, ফিলিপাইন্স, ভিয়েতনাম ও তাইল্যাণ্ডে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। মালাগাসির (মাদাগাস্কার) দক্ষিণ-পূর্বে রিইউনিয়ন দ্বীপে একটি বেতার-নৌঘাঁটি (রেডিও নেভিগেশন স্টেশন) স্থাপন করার প্রস্তাবও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগরে একটি প্রতীকী ধরনের টাস্ক ফোর্স রেখেছে, যেটি মাঝে মাঝে লোহিত সাগরেও টহল দিয়ে আসে।[১৭]

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ব্রিটেনের মরিশাস ও সেকিল্লেস দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে কয়েকটি "অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি"। ব্রিটেন ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র আর দূরপ্রাচ্যের মাঝখানে **সিনেট প্রজেক্ট** উৎক্ষেপ করেছে। এটি আসলে হ'ল সামরিক উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা (এটি বিশ্বের অন্যতম উন্নত ব্যবস্থা)। **আনজুক শক্তি** নামে ত্রি-জাতীয় কমনওয়েল্থ শক্তির

অন্যতম অংশীদার হিসাবে ব্রিটেন গ্যান ও মাসিরাতে "ব্রিটিশ যোগসূত্র"[১৮] রূপে কয়েকটি ঘাঁটি রেখে দিয়েছে।

এই নয়া ব্রিটিশ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে একটি বেতারপ্রেরক যন্ত্র সমেত মহাকাশযান। যেটি ১৯৬৯ সালের ২২শে নভেম্বর কেপ কেনেডি থেকে ছোঁড়া হয়। এটি এখন রয়েছে কেনিয়ার[১৯] উপকূল ছাড়িয়েই ভারত মহাসাগরের উপরকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ৩৬,৮০০ কিমি. উপরে এক স্থির কক্ষপথে।

সোভিয়েতের নামমাত্র উপস্থিতি আর সারি সারি মার্কিন-ঘাঁটির মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে তার উল্লেখ ক'রে ডিফেন্স ইনস্টিট্যুটের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয় : ঐসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কেন ভারত রুশ নৌচলাচলের থেকে মার্কিন গতিবিধি সম্পর্কে বেশী শঙ্কিত।[২০]

সোভিয়েত নৌশক্তির বৃদ্ধি এবং মহাসাগর অঞ্চলে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলির আনাগোনা এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে বিপৎস্বরূপ বলে যে শোরগোল[২১] তোলা হয়েছে তার মূলে রয়েছে ঐ অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন নৌশক্তির উপস্থিতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা—যে অঞ্চলকে উপকূলবর্তী দেশগুলির সরকারেরা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বৃহৎ শক্তিগুলির নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত এক শান্তিপূর্ণ সমুদ্র হিসাবে রাখতে চায়। ভারত মহাসাগরে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান ও নৌঘাঁটির জাল বিস্তার ক'রে এবং বড়সড় রকমের নৌশক্তির উপস্থিতি ঘটিয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি বোঝাতে চাইছে যে ভারত মহাসাগরকে পরমাণুশক্তিমুক্ত এলাকা হিসাবে রাখার জন্য বিশেষ ক'রে ভারত ও অন্যান্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করার প্রয়োজন তারা বোধ করছে না।

অন্যদিকে ভারত মহাসাগরকে পরমাণুভীতিমুক্ত এবং শান্তির সমুদ্রে পরিণত করার আফ্রো-এশীয় বাসনাকে স্বাগত জানিয়ে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে প্রধান সম্পাদক ব্রেজনেভ তাঁর রিপোর্টে শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সংগ্রামের অন্যতম নির্দিষ্ট মৌলিক কর্তব্য হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরমাণুশক্তিমুক্ত এলাকা স্থাপনের প্রয়াসকে বাড়িয়ে তোলার কথা বলেছেন।

১৯৭০ সালের ১২ই জুন মস্কোর একটি নির্বাচনী সভায় ব্রেজনেভ বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রথম এক বৃহৎ-শক্তির সামনের সারির

নেতা প্রকাশ্যে দূরবর্তী দরিয়া থেকে নৌশক্তি তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর দেশের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। অবশ্যই, যদি অন্য বৃহৎ-শক্তিগুলি সেই পথ অনুসরণ করতে রাজী হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সোভিয়েত সফর শেষে ১৯৭১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত ভারত-সোভিয়েত যুক্ত ইস্তাহারে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে অন্যান্য বৃহৎ-শক্তিগুলিকেও এ বিষয়ে সমান দায়িত্ব নিতে হবে। ভারত মহাসাগরে ঘাঁটি তৈরি করার কোন বাসনা যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই, সেই তথ্যটি সমর্থন করেছেন ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্‌যোগে ১৯৭৩ সালের ৯-১০ মে তারিখে "ভারত মহাসাগর"-এর উপরে দুদিনব্যাপী এক আলোচনা সভায় শ্রীস্বরণ সিং বলেন, ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌঘাঁটির "কোন প্রমাণ" নেই।[২২] আলোচনা সভার উদ্‌বোধন ক'রে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীজি. এস. ধীলন বলেন, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটিকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টি অনেকদূর অগ্রসর হতে পারে যদি বৃহৎ-শক্তিগুলির পক্ষ থেকে মেলে আন্তরিক প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেন, পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ-শক্তিগুলি যাতে ভারত মহাসাগরে নৌশক্তির মহড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকে তার জন্য তাদের ওপর বন্ধুত্বপূর্ণ চাপ সৃষ্টির" মাধ্যমেই এটা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, "এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে বৃহৎ-শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণাবর্তে ভারত মহাসাগরকে টেনে আনা হচ্ছে।" মহাসাগর অঞ্চলে বৃহৎ-শক্তিগুলির জাহাজ চালানোর বিষয়ে সম্ভবতঃ কেউ আপত্তি করতে পারে না ; কিন্তু এটাও দেখা দরকার যে সমুদ্রে তাদের নৌচলাচল যেন কোন দেশের স্বার্থ বিপন্ন না করে।[২৩] কিছু আগে শ্রীস্বরণ সিং এমন ইঙ্গিত দেন যে ভারত মহাসাগরে বৃহৎ-শক্তিবর্গের যুদ্ধজাহাজগুলি বিনা প্রয়োজনেই ঘোরাফেরা করে। বিগত ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর পাঠিয়ে ভারতকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ভারত সাহসের সঙ্গে ঐ শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিল।

লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভারতের প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওআর্ড জি. হুইটলামের ভারতে চারদিনব্যাপী শুভেচ্ছা সফর শেষে ১৯৭৩ সালের ৬ই জুন একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত

হয়। তাতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া উভয়েই ভারত মহাসাগরে শান্তির এলাকা স্থাপন করার সংকল্প পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চালাতেও উভয় পক্ষ সম্মত হন।[২৪]

কানাডা রওনা হওয়ার আগে বেলগ্রেডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ক'রে তোলার ভারতীয় আবেদনে আঞ্চলিক সমর্থনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'লে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে হুইটলাম সম্প্রতি ভারত সফরে এসে এই প্রস্তাব সমর্থন করছেন এবং সেটা একটা উৎসাহজনক ঘটনা।[২৫]

তাছাড়া, ভারত মহাসাগর থেকে বৃহৎ-শক্তিগুলির ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়ার দাবি রয়েছে সর্বস্তরেই। এটা বোঝা আদৌ কষ্টসাধ্য নয় যে ভিয়েতনাম থেকে তার সৈন্যাপসারণ করা সত্ত্বেও ভারতমহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে যে-কোন সংঘর্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ করার মত সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ-বিদীর্ণ কম্বোডিয়াতে ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে। ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় যদি ঢোকে, ভারত মহাসাগরে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তাকে যুদ্ধ করতে হবে তাহলে ঐ অঞ্চলে সে তার নৌবাহিনী পাঠাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?" ছোট দেশগুলির ব্যাপারে বৃহৎ-শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ আসলে হ'ল বৃহৎ-শক্তি-সুলভ ঔদ্ধত্যেরই ফল।"[২৬]

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষদিকে যখন আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ লাগল তখন এতসব যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের তোয়াক্কা না ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ১৯৭৩-এ অক্টোবর মাসের শেষদিকে তার টাস্ক ফোর্স নৌবহর পাঠাল ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সরকারী মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দিল্লী বিমান বন্দরে ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন টাস্ক ফোর্স বৃহৎ-শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর মতে, এক বৃহৎ-শক্তির নৌবহরের "বৃহদাকার ও দীর্ঘস্থায়ী" উপস্থিতি অন্য বৃহৎ-শক্তিগুলির নৌবহরগুলিকে ডেকে আনবেই। তিনি বলেন, ভারত মহাসাগরে টাস্ক ফোর্স-এর গতিবিধির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে যে বিবৃতিটি দিয়েছে

সেটির খুঁটিনাটি সরকার পরীক্ষা ক'রে দেখছেন। তিনি ঐ সঙ্গে একথাও যোগ করেন, "এটা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়, মার্কিনীদের সামনে কি ধরনের কাজ রয়েছে যাতে তথাকথিত টাস্ক ফোর্স গঠন করাকে তারা প্রয়োজন ব'লে মনে করেছে।" আমরা মোটেই বুঝতে পারছি না, আমেরিকানদের সামনে এমন কি টাস্ক (করণীয় কাজ) রয়েছে, যার জন্য সে টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।*

মার্কিন সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তার নৌবহরের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন করতে নৈতিকভাবেই বাধ্য করল। বিশ্বজোড়া অন্যান্য বিষয়ের কথা বাদ দিলেও মস্কো দেখল ভারত মহাসাগরে মার্কিন রণতরীগুলি নিয়ে আসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন, কারণ এর ফলে মার্কিন রণতরীগুলি সোভিয়েতের দক্ষিণাঞ্চলের আরও কাছাকাছি এসে পড়বে। অন্যদিকে, কূটনৈতিক মহল মনে করলেন যে ১৯৭৩-এর নভেম্বর মাসের শেষাশেষি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের ভারত সফরের সঙ্গে মার্কিন তৎপরতার সময়টির রয়েছে কোন যোগসূত্র। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, কমিউনিস্ট চীনও নাকি এই সফরকে তেমন ভাল চোখে দেখেনি। কিছুদিন আগে মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিংগার যখন চীন সফরে গিয়েছিলেন তখন কিন্তু ভারত কোনরকম আশঙ্কা প্রকাশ করেনি।

পারস্য উপসাগরীয় রাজনীতি ও ভারত

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারতের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। ভারত মহাসাগরের উপর মোড়লি লাভের জন্য বৃহৎ-শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রণনীতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকার শান্তি তো বিপন্ন হচ্ছেই, তবে শান্তি তার চেয়ে বেশী বিপন্ন হচ্ছে উচ্চাভিলাষী ক্ষুদ্র শক্তি ইরানের কাছ থেকে। সে এখন পারস্য উপসাগর ও তার সংলগ্ন সমুদ্রাঞ্চলে শান্তিরক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব।[২৭] বিদেশ থেকে কেনা তিন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্রের একটা অংশ এই তৈলসমৃদ্ধ দেশটি ব্যবহার করতে চলেছে। এই ছোট্ট দেশটির এই ধরনের হঠকারী অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে ভারতকে সদাসতর্ক থাকতে হবে। নিজের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করার বদলে শাহ্ ভারত মহাসাগরের এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনিশ্চিত জুয়াখেলায় তেল বিক্রির মূল্যবান অর্থ ব্যয় করছেন। শক্তিশালী

পশ্চিম এশীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার স্বপ্নে মশগুল হয়ে ইরান হরমুজ প্রণালীর দুইপারে চাহ্‌বহ্‌র ও বন্দর আব্বাস-এ দুটি বিরাট সামরিক ঘাঁটিও তৈরি করছে। তার উদ্দেশ্য হ'ল ভারত মহাসাগরগামী তেল চলাচলের পথের ওপর কর্তৃত্ব করা। এটা ঠিক যে ভারত ও ইরানের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘাত নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতি তাদের ভিন্ন মনোভাবের ফলেই দুটি দেশ নিয়েছে ভিন্ন গতিপথ।

ভারত মহাসাগরে তাঁর দেশের সামরিক ক্ষমতাকে ছোটখাট বৃহৎ-শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করার যে আহ্বান শাহ্‌ জানিয়েছেন তা ইরানকে পাকিস্তানের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, যাতে ক'রে ইরানের অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কোন সংঘর্ষে ব্যবহার করতে পারে। এই প্রচেষ্টার মার্কিন সামরিক-শিল্প জোটের পূর্ণ আশীর্বাদ তার সঙ্গে রয়েছে। এর থেকে স্পষ্টই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঐ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বিপদাশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবার ব্যাপারে ভারতের যে কোন ভূমিকা আছে এমন ধারণা তাদের কাছে রুচিকর নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন কংগ্রেসে তাঁর যে দিবসের ভাষণে সম্প্রতি উপমহাদেশে শক্তিশালী ক্ষমতা হিসাবে ভারতের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে যেসব তোষামোদী উক্তি করেছেন সেগুলি এশিয়ার সমস্যাবলীর প্রতি তাঁর বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গোপন করেনি। কেবলমাত্র ভারত-সোভিয়েত যৌথ প্রয়াসই মার্কিন শাসকচক্রের প্রতারণা-মূলক ভাবভঙ্গীর যোগ্য প্রত্যুত্তর হতে পারে।

পারস্য উপসাগরে ভারতের "পা রাখার" কোন ইচ্ছা নেই

সাম্প্রতিক কালে ইরানের প্রচারে ভারতকে পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী তৈলবাহী দেশগুলিতে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের যন্ত্ররূপে দেখানো হয়েছে। পারস্য উপসাগরে ঘাঁটি করার চেষ্টার যে অভিযোগ ভারতের ঘাড়ে চাপানো হয়, ভারত সে সম্পর্কে তার বক্তব্য বার বার ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে ক্রমাগত যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে সেগুলিকে একাধিকবার ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যমূলক ও অপপ্রচারমূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে ভারত ঐ অঞ্চলে সামরিক তোড়জোড় বাড়িয়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। নয়াদিল্লীর সরকারী মহল থেকে ১৯৭৩ সালের ৭ই জুলাই এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, পারস্য উপসাগর বা

পশ্চিম এশিয়ায় ভারত ঘাঁটি করার চেষ্টা করছে—এই পুরো ধারণাটাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মার্কিন সংবাদপত্রগুলির রিপোর্টে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, বিশ্বের ঐ অঞ্চলটিতে ভারতের কোন ধরনের অপ্রকাশিত সামরিক আঁতাত আছে। কিন্তু আসল তথ্য হ'ল, ইরাক ও ভারতের মধ্যে কোনকালেই কোন গোপন বোঝাপড়া ছিল না আর এখনও নেই, আর নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাও। সরকারী মহল থেকে এই মর্মে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।[২৮]

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারত বিভিন্ন সময়ে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠা সম্পর্কে তার শঙ্কা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত এই আশাও প্রকাশ করেছে যে ঐ অঞ্চলের দেশগুলিতে শান্তি বিঘ্নিত হবে না এবং পারস্য উপসাগর, আরব সাগর সমেত সমগ্র ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে শান্তির এলাকা রূপে থাকতে দেওয়া হবে—যা ইতিমধ্যেই এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। ভারত এই অঞ্চলে কোন রকমের শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার উচ্চাশা পোষণ করে না।

ওমান ও ইরাকে ভারতের উপস্থিতির বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলির "প্রমাণ" সম্পর্কে ভারত তার মতামত পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে। বাগ্‌বিতণ্ডার শুরু থেকেই সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে যে বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান বিনিময় সম্পর্কে ভারতের সহযোগিতার বিষয়টি গোপন করার কোন চেষ্টা কখনও করা হয়নি। এটা হ'ল অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান বিনিময় সংক্রান্ত ভারতীয় নীতির একটা অংশ।

ভারতীয় প্রশিক্ষকরা ইরাকী বিমানচালকদের মিগ্‌ যুদ্ধবিমান চালনা শেখাচ্ছেন বলে মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত রিপোর্টের উল্লেখ ক'রে সরকারী সূত্রে বলা হয় ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ছোট দল বিগত ১৪ বছর ধরে ইরাকে রয়েছে এবং সেটির সেখানে থাকার বিষয়টি নতুন কিছু নয় এবং সে বিষয়ে কোন গোপনীয়তাও নেই। অধুনা এই দলটির শক্তি কমিয়ে আনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার যে কয়েকটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের (যারা তাদের রক্ষী ও অফিসারদের এখানে শিক্ষা দিতে চায়) শিক্ষার্থীরাও ভারতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই ধরনের সহযোগিতায় গোপনীয় ব্যাপার কিছু নেই। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত অন্যান্য দেশে ভারতীয় সামরিক কর্মচারীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়।[২৯] ওমানে ভারতের

"উপস্থিতি"র অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী সূত্রে বলা হয়, ঐ দেশটির সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যগত, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে, এবং বেশ কিছুকাল ধরেই ভারতীয় ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার ও কলাকুশলীরা সেখানে কাজ করছেন। সরকারী সূত্র ব্যাখ্যা ক'রে বলেন, সেখানে যে স্বল্পসংখ্যক সামরিক কর্মচারী আছেন, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের কিছুই করবার নেই।[৩০]

একই ভাবে, ইরাকের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি ইরাকের কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার এক চুক্তি হয়েছে এবং সবরকম অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ছে। বিগত ১৯৭৩ সালে দুটি দেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। তাহলে, ভারত ও ইরাকের মধ্যেকার ব্যাপক সহযোগিতার একটি অংশকে আলাদা করে জুজু হিসাবে দেখানোর যুক্তি কোথায়?

১। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেঙ্ ফি তাঁর সাম্প্রতিক বিশ্বসফরে চীনের মধ্যপ্রাচ্যনীতির আমূল পরিবর্তনের যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি শুধু সেন্টোর পুনরুজ্জীবনকেই আশীর্বাদ জানাননি ইরানের নতুন রণসজ্জাকেও প্রশংসা করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওমান ও আরব উপসাগরের পপুলার মুক্তি ফ্রন্ট এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য বামপন্থীদের যে পিকিং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করেছে সে রকম সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। চীনের সম্প্রসারণবাদী উচ্চাশার জন্যই পিকিংয়ের মার্কিন সামরিক-শিল্প সমাহারের লেজুড়বৃত্তি করা, আরব গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সেন্টোর সঙ্গে একান্ত হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আরব গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি ও কুর্দের মোল্লা বরজানির বদলে ইরানের শাহ্, কিছু খুদে শেখ আর ভুট্টোই হলেন চীনের নতুন রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার রণনীতির ভরসা। ভবিষ্যতে এঁরা চীনের পুরো মদত পাবেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শত্রুতা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করার জন্যে চীনের কর্ণধারদের একনিষ্ঠ মার্কিন সমর্থক এবং দোসরের ভূমিকা নিতে হবেই; এবং এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন পাশবিকতা বলে যা-কিছুকে সে ভর্ৎসনা ক'রে এসেছে সে সবকিছুই তাকে গলাধঃকরণ করতে হবে। (বিস্তৃত

বিবরণের জন্য নয়াদিল্লীর সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড, পৃঃ ৭, কলম ১-২ দ্রষ্টব্য।)

এটা কি বেদনাদায়ক নয় যে, পারস্য উপসাগরীয় ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলন রাতারাতি চীনের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেল। আরব গেরিলারা তাদের নাশকতামূলক কাজকর্মের জন্য নিন্দিত হচ্ছে এবং পিকিং ভ্রমণের জন্য তাদের যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে।

চীনের আকস্মিক মত-পরিবর্তনের সংবাদ লণ্ডন টাইম্‌স এবং ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর পিকিংস্থ সংবাদদাতাদের দ্বারা প্রেরিত এবং ২রা অগস্ট ১৯৭৩-এ প্রকাশিত রিপোর্টে এটা যতটা ভালভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আর কোথাও তা হয়নি। লণ্ডন টাইম্‌স-এর রিপোর্ট অনুসারে, চীনারা মনে করেন যে ইরান সোভিয়েত পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে সাহায্য করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ইরানের শাহ্ যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন চীনারা তাতে খুশী হয়েছেন। অন্যদিকে ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চীনের মতে এশিয়ায় বিশিষ্ট শক্তি হিসেবে পাকিস্তানকে খতম করার চেষ্টায় ভারতীয়রা আপাত দৃষ্টিতে মস্কোকে সমর্থন করছে। যে-কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক অতি সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন যে, এটা ভারতের বিরুদ্ধে নিছক অপপ্রচার মাত্র।

* লণ্ডন ইনষ্টিট্যুট অব্ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, 'মস্কো এবং এশিয়ার অধিকাংশ জায়গায় পৌঁছবার মত' পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেটের উন্নতি ঘটাতে চীন সক্ষম হয়েছে। এই সংস্থার ১৯৭৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত '১৯৭৩-৭৪-এ শক্তির ভারসাম্য' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে নতুন চীনা রকেটের পাল্লা হ'ল ৫৬০০ কিলোমিটার। এই নতুন রকেটটি নাকি 'আরও বেশী দূরপাল্লার বহুস্তরবিশিষ্ট মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র'। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩-এর টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১, কলম ২-৪ দ্রষ্টব্য।)

২। ব্লিজ (বোম্বাই), ৯ই জুন, ১৯৭৩, পৃঃ ১০, স্তম্ভ ২।

৩। এ সম্বন্ধে আরো জানবার জন্য বিজয়চাঁদ জৈনের লেখা 'চীনের বৃহৎ-

জাতিসুলভ দম্ভ' (নয়াদিল্লী, এশিয়া স্টাডি সার্কেল, ১৯৭১), পৃঃ ৩-৩৬ দেখুন।

৪। উত্তর আমেরিকায় কিছু স্বাধীন মতাবলম্বী পাকিস্তানী 'দি পাকিস্তান জার্নাল অব্ নিউ ইয়র্ক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। এই পত্রিকা সম্প্রতি জানিয়েছে, "ভারতীয় শিবিরগুলিতে যত যুদ্ধবন্দী আছে পাক-জেলখানাগুলিতে আছে তত রাজনৈতিক বন্দী।" পত্রিকাটির সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ভুট্টোর সরকারের অতিস্বল্প শাসনকালে দেশে রাজনৈতিক দমননীতির এক অপ্রতিহত শাসন চলছে।" সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে, "কুখ্যাত সামরিক শাসনকালের চেয়েও অনেক বেশী রাজনৈতিক বন্দী—কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পাক-জেলখানাগুলিতে পচছেন।" পত্রিকাটি নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন, "এই রাজনৈতিক দমননীতির বহরটা কিরকম?" এবং পত্রিকাটি যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান বহরের এবং পাক জাতীয় ব্যাঙ্কের পুরো পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল, সে জবাব দিচ্ছে: "রাজনৈতিক ভীতি যেখানে ক্রমশঃ বাড়ছে এবং সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমগুলি হয় নিয়ন্ত্রিত অথবা ভয়ঙ্করভাবে খণ্ডিত সে রাজত্বে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়।" পত্রিকাটির মতে "কারাগারে নিক্ষিপ্ত, ধৃত, যে-কোনও ভাবে অভিযুক্ত অথবা কোন-না-কোন ভাবে নাকাল হওয়া লোকের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে গেছে।"

মার্কিন 'নিউজ উইক' পত্রিকা 'ভুট্টোর রাজত্বে' শীর্ষক একটি সাক্ষাৎকার ধরনের রচনায় ভুট্টো ও তাঁর দেশের যে ছবি এঁকেছেন তা মোটেই সুন্দর নয়। "ভুট্টো পূর্ণ ক্ষমতার জন্য আকুল, কোন রকম বিরোধিতা বা সমালোচনা সহ্য করতে তিনি নারাজ। সাংবাদিকদের গ্রেফতার ক'রে, সরকারের সমালোচনামূলক লেখা ছাপার জন্য সম্পাদকদের বিরুদ্ধে আদালতে সাজানো মামলা দায়ের ক'রে সংবাদপত্রগুলিকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের সঙ্গে শ্রীভুট্টো যে ব্যবহার করেছেন তার তুলনায় তো এসব ছেলেখেলা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যখনই প্রকাশ্য জনসভা করার চেষ্টা করেছে, বার বার সেগুলি

রাজনৈতিক গুণ্ডারা বন্দুক, স্টীলের রড আর ডাণ্ডা হাতে ভেঙে দিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত মার্শাল আসগর খানের বিরুদ্ধে সরকারী ক্ষমতা যেরকম অবিশ্রান্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর কোন ক্ষেত্রে সেরকমটি ঘটেনি। তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।"

৫। কে. পি. এস. মেনন, "চীন-ভারত সম্পর্ক" : একটি বিশ্লেষণ, মাদার-ল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ৭ জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৫, কলম ৮।

৬। দি স্টেটস্ম্যান (নয়াদিল্লী), ২০ জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, কলম ৭-৮।

৭। ঐ।

৮। আরও বিশদ বিবরণের জন্য "চায়না অ্যাসেস্‌মেণ্ট," নিউজ রিভিউ অন চায়না, মঙ্গোলিয়া অ্যাণ্ড কোরিয়াস (নয়াদিল্লী, ইনষ্টিট্যুট অব্ ডিফেন্স্ স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস), জুন ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৮ দ্রষ্টব্য। ডিফেন্স ইনষ্টিট্যুট তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, কলহ শুরু হওয়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে যে দুটি বিমান দিয়েছিল সে দুইটির অনুকরণে চীন টিইউ-১৬এর এক পরিবর্তিত সংস্করণ তৈরি করছে। গড়ে মাসে পাঁচটি ক'রে এই বিমানের উৎপাদন সম্ভবতঃ সেনইয়াঙ্ রাজ্যবিমান কারখানায় ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময় শুরু হয়। (ঐ, পৃঃ ২৬৯)

শোনা গেছে যে চীন প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে সোভিয়েতের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য তার নৌশক্তিকে বিরাট ভাবে বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের এই পাল্লা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে গোপন মদত যোগাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইনষ্টিট্যুট অব্ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক পর্যালোচনা 'ইনডিয়া ইন ওআর্ল্ড স্ট্র্যাটেজিক এনভিরনমেণ্ট'-এ এই মূল্যায়ন করেছেন।

এই মূল্যায়নে বলা হয়েছে, ১৯৭০-এর মে মাসে চীনের জাহাজগুলো আন্দামানের কাছে প্রথম দেখা যাওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে ভারত মহাসাগরে চীনের নৌ-তৎপরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ইনষ্টিট্যুটের জনৈক বিশ্লেষকের মতে ভারত মহাসাগরে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করার মত যথেষ্ট পরিমাণে নৌশক্তি বর্তমানে চীনের

নেই। সুতরাং কয়েক বছরের জন্য এর প্রভাব হবে নেহাতই প্রতীকী ধরনের। তবে চীনের ভাবগতিক দেখে মনে হয়, জোট-নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় দেশগুলির মধ্যে নিজের প্রভাব আরও বিস্তৃত করতে সে বদ্ধপরিকর।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীনানেতৃত্ব তাঁদের নৌশক্তির দুর্বলতার বিষয়টি উপলব্ধি ক'রে সম্ভবতঃ নৌশক্তি গড়ে তোলা ও তার আধুনিকীকরণের কর্মসূচী নিয়েছেন। স্পষ্টতঃই নৌশক্তি গড়ে তোলার কর্মসূচীর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চীনারা গত কয়েক বছর ধরে তাদের জাহাজনির্মাণ-শিল্পের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে। এভিয়েশন উইক পত্রিকায় ১৯৭০ সালের ২৪শে অগস্ট প্রকাশিত একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত ক'রে তাঁরা বলেছেন, চীন সম্ভবতঃ একটি আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরীক্ষা চালাবে যা ভারতের ওপর দিয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরের আফ্রিকার উপকূলবর্তী জাঞ্জিবার দ্বীপের কাছে গিয়ে পড়বে।

পরবর্তী এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীন ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে তার প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিরীক্ষণ ঘাঁটি বসাবার অনুমতি চেয়েছে পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলির কাছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীন ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌশক্তির উপস্থিতিকে নিন্দা করে চলেছে। সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে গানবোট কূটনীতির মাধ্যমে "সুয়েজ থেকে ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত সামুদ্রিক প্রাধান্য সৃষ্টি ক'রে চীনকে ঘিরে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।" তার আরও অভিযোগ হ'ল, ভারতের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য "চীনকে ঘিরে ফেলে ভারত মহাসাগরে জারদের স্বপ্ন সার্থক ক'রে তোলার" ইচ্ছা-প্রণোদিত। চীন বলছে, চীন-সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা তাদের উত্তেজনাপূর্ণ সংলগ্ন সীমান্ত থেকে বহুদূরে অনেক জায়গাতেই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ ইয়েমেন, তানজানিয়া এবং পাকিস্তানে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি তীব্র এবং তা ক্রমশঃ সোমালিয়া ও সিংহলে ছড়িয়ে পড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আরব দেশগুলিতে অবশ্য সোভিয়েত

ইউনিয়ন প্রভাবশালী ; কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তান, তানজানিয়া এবং নেপালে চীনের প্রভাব কিছুটা বেশী।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, চীনারা ভারত মহাসাগরের আশপাশের দেশগুলিকে নিজের দিকে টানবার জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

[ইনডিয়া ইন ওআর্ল্ড স্ট্রাটেজিক এনভিরনমেন্ট—অ্যানুয়াল রিভিউ (নয়াদিল্লী, ইনস্টিট্যুট অব্ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস), এপ্রিল ১৯৭৩, ভল্যুম ২, পৃঃ ৭২১-২৩।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য দেবেন্দ্র কৌশিক-এর দি ইনডিয়ান ওশান— টোআর্ড্স এ পিস জোন (নয়াদিল্লী, বিকাশ পাবলিকেশন্‌স, ১৯৭৩), পৃঃ ৫৬-৭২ দেখুন।]

৯। ব্লিজ (বোম্বাই), ৯ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১০, পঞ্চম কলম।

১০। কানাডার ওটোয়ায় ১৯৭৩-এর ২৪শে জুন তারিখে এক টেলিভিশন প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধীর মন্তব্য।

(দি হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ২৫শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ১ম কলম।)

১১। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ৪ঠা জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৪, ৮ম কলম।

১২। ঐ।

১৩। আরও বিশদ তথ্যের জন্য দেবেন্দ্র কৌশিক-এর দি ইনডিয়ান ওশান—টোআর্ড্‌স্ এ পিস জোন (বিকাশ পাবলিকেশন্‌স্, ১৯৭২), পৃঃ ৩০-৪৫।

১৪। ইনডিয়া ইন ওআর্ল্ড স্ট্রাটেজিক এনভিরনমেন্ট—অ্যানুয়াল রিভিউ (নয়াদিল্লী, ইনডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব্ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস), এপ্রিল ১৯৭৩, ভল্যুম ২, পৃঃ ৬৭৩।

১৫। ঐ, পৃঃ ৬৮৫, ১ম কলম।

১৬। ঐ।

১৭। ঐ।

১৮। ঐ, পৃঃ ৬৭৭, ১ম-২য় কলম।

১৯। ঐ, পৃঃ ৬৮১, ২য় কলম।

২০। ঐ, পৃঃ ৬৯০-৯১

২১। আরও বিশদ তথ্যের জন্য কে. সুব্রামনিয়মএর "দি ওশনিক ব্যালান্স

অব্ পাওয়ার", দি মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ২৯শে অগস্ট ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ৩য়-৬ষ্ঠ কলম।

২২। দি ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্তান টাইম্‌স্ (নয়াদিল্লী), ২রা মে ১৯৭২, পৃঃ ৩, ১ম কলম।

২৩। ঐ, ১ম-৩য় কলম।

২৪। ঐ, ৬ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ১ম-৩য় কলম।

২৫। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৩ই জুন ১৯৭২, পৃঃ ১, ২য় কলম।

২৬। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৩ই মে ১৯৭৩।

* ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্তান টাইম্‌স্ (নয়াদিল্লী), ১লা নভেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ২য়-৪র্থ কলম।

২৭। শাহ্ দাবি করেন তেল উৎপাদন ও পশ্চিম গোলার্ধে তা পৌছে দেওয়ার জন্যই এই বিপুল সামরিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে দুর্বল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আরব গেরিলারা ছাড়া আর কারুর কাছ থেকেই বর্তমানে বা সুদূর ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ আছে। এই তেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি অর্থ হবে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ।

তাছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করার জন্য আমেরিকার সঙ্গে এক চুক্তি করেছে। এই অবস্থায় ইরানের তেল সরবরাহ সম্পর্কে কোন রকম আশঙ্কার কথা নেহাতই হাস্যকর।

২৮। সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ৪ জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৬, ১ম কলমে উদ্ধৃত সরকারী মন্তব্য।

২৯। ঐ।

৩০। ঐ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জোট-নিরপেক্ষতার সাফল্য

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশন ও বেলগ্রেড টেলিভিশনের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী সঠিকভাবেই বলেছেন যে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি "পূর্ব বা পশ্চিমের কোন দেশের সঙ্গেই ভারতের বন্ধুত্বের পথে বাধা নয়।"[১] এটা অনস্বীকার্য যে এই চুক্তি ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী সুদৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে দুটি দেশই তাদের পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি আগের মতই শ্রদ্ধাশীল। একের বন্ধু বা শত্রুর সঙ্গে অপরের ভিন্ন সম্পর্ক থাকতে কোন বাধা নেই।

গত ১৯৫৫ সালে দু'দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সফর বিনিময়ের পর থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়নও ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে প্রশংসার চোখেই দেখে আসছে। ঐ বছর সোভিয়েত নেতাদের ভারত সফরের পরেই সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রধান সুপ্রিম সোভিয়েতকে জানান যে ভারত হ'ল এক জোট-নিরপেক্ষ দেশ এবং "আমাদের ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সে বিশ্বাস ও সম্মান পাবার যোগ্য।" তিনি আরও বলেন: "আমরা এবং আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা উভয়েই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এমনভাবে উন্নত ও শক্তিশালী করতে চাই যাতে অন্যান্য দেশের সাথে ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কোন পরিবর্তন না হয়।"[২]

একই ভাবে, বহুসময় ব্রেজনেভ এবং কোসিগিন উভয়েই জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি তাঁদের নীরব সমর্থন জানিয়েছেন। মস্কোয় ১৯৬৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রচারিত এক যুক্ত ইস্তাহারে দুই সোভিয়েত নেতা ও ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে নেন।[৩] রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির সম্মানে প্রদত্ত এক মধ্যাহ্নভোজে, ১৯৭০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি শ্রীনিকোলাই পোদগর্নি ভারত সরকারের জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করেন।[৪]

এমনকি মৈত্রীচুক্তির ৪নং অনুচ্ছেদে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষভাবে ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে সুস্পষ্টভাবে মেনে নিয়ে পুনরায় দৃঢ়তার

সঙ্গে একথা বলে যে, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা ও বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে এই নীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[৫]

চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তিটিকে চীনের সাথে (এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও)[৬] সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে বাধাস্বরূপ বলে মনে করা ভুল হবে। মৈত্রীচুক্তি সম্পর্কে চীনের মন্তব্য থেকে এমন ধারণাই জন্মায় যে চীনা নেতারাও মনে করেন, ভারতের স্বাধীন বৈদেশিকনীতি চুক্তিটির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়নি। চৌ-এন-লাই বিশিষ্ট মার্কিন সংবাদদাতা জেম্‌স রেস্টনের কাছে ...র্কে যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য। চীনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ব'লে রেস্টন যা উদ্ধৃত করেছেন তার মর্মার্থ হ'ল—চুক্তিটি চীনের বিরুদ্ধে করা হয় নি। ঐ সময়ে চীনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর মন্তব্যও ছিল অনুকূল ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বলেন, "এটি হ'ল সামনের দিকে একটি ছোট পদক্ষেপ।" তিনি চৌ-এন-লাইকেও পত্র লিখেছিলেন। তিনি যে তাঁকে তৎকালীন পাক-প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান-এর পিছনে চীনের সমর্থনকে নিষ্ক্রিয় করার অভিপ্রায়েই চৌকে পত্র লিখেছিলেন এই তথ্যটি প্রশ্নাতীত ভাবেই প্রমাণ করে যে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে আচরণে ভারত তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণই রেখেছে।

তাছাড়া, সীমান্ত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার ...য়েকটি বাস্তব কারণও দু'দেশের রয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হ'ল, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ভারত ও চীন সমানভাবেই নিপীড়িত ...য়েছে। একমাত্র পার্থক্য হ'ল, ভারত যখন একটি মাত্র শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছিল তখন চীনে চলেছিল পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর নির্মম যৌথ শোষণ। ...নকে তারা পরিণত করেছিল সান-ইয়াৎ-সেন বর্ণিত এক "জঘন্যতম উপনিবেশে"।

ভারত ও চীন উভয়েই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নোংরামির বিরুদ্ধে নিন্দা করার ব্যাপারে একমত। এটাও স্মরণযোগ্য—পরবর্তী কালে ইঙ্গ-জাপান ...মাতাতের সাহায্যে শক্তিশালী হ'য়ে জাপান যখন সাম্রাজ্যবাদের পথে পা বাড়িয়ে চীনের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু ...রছিল, ভারত অতি দ্রুত তার প্রতিবাদ করেছিল। এটা এশিয়ার ইতিহাসের ...কান নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি জাপানকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ভালবাসতেন, তিনিও অত্যন্ত কঠোর-

ভাবে জাপানকে নিন্দা করেছিলেন। জাপানের শোভন সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের প্রতি তাঁর আবেগপূর্ণ দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেন :

জাপান দেখিয়ে দিচ্ছে রক্তপিপাসু শয়তান শুধু যে পশ্চিমেই সৃষ্টি করা যায় তা নয়, এশিয়াতেও মানুষের দুঃখদুর্দশার বিনিময়ে তাকে পালন-পোষণ করা যায়।

জওহরলাল নেহেরুও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অতি সুনির্দিষ্টভাবে চীনের ওপর জাপানী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন থেকে শুরু করে মাও-ৎসে-তুঙ্ ও চৌ-এন-লাই প্রমুখ চীনা নেতারা যথেষ্ট সাহসের সাথে ব্রিটিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ভারতের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকরা যখনই ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমন করার জন্য লৌহমুষ্টি দেখাতেন তখনই চীনা নেতারা তার প্রতিবাদ করতেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর কঠোর এবং নির্মম দমননীতি প্রয়োগের অপকর্ম থেকে ব্রিটেনকে বিরত করবার জন্য তাঁরা বিশ্বজনমত ও পশ্চিমের উদার গণতন্ত্রবাদীদের কাছে আবেদন জানাতেন যে তাঁরা যেন ব্রিটেনের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেই দমননীতি প্রতিহত করার চেষ্টা করেন।

চীনে কমিউনিস্ট বিজয়ের পর, জওহরলাল নেহেরু রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির জন্য অবিশ্রান্ত ভাবে চেষ্টা করে গেছেন। সম্প্রতি ১৯৭৩ সালের ১৯ জুন কানাডার আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, "শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে যে তার আইনসঙ্গত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এতে ভারত অত্যন্ত আনন্দিত।"[৭]

চীনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা : পুনর্মিলনের মরশুম

এই পটভূমিকার কথা মনে রেখে, দুটি দেশেরই উচিত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে সুদে-আসলে উশুল করার মনোভাব ত্যাগ করা। যে বিষয়টি এই সমস্যাকে সহজ ক'রে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে তা হ'ল এই যে, ভারত কখনও চীনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ব'লে মনে করেনি, আর ক্ষমতার রাজনীতির পাশাখেলা ভারতের কাছে নিতান্তই বর্জনীয়। চীনে কমিউনিস্টরা তাদের উগ্র মনোভাব কাটিয়ে উঠে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতিকে স্বাগত জানাক—এটাই কাম্য। পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্রীদের সাথে যে শক্রর আঁতাত তাঁরা গড়ে তুলেছেন তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, যেহেতু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শত্রুতা কোন চিরস্থায়ী বস্তু নয়। 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই'-এর

সেই দিনগুলি আবার ফিরে আসুক। ভারত ও চীনের মধ্যে 'অমর বন্ধুত্ব'-এর সাময়িক অবলোপ—অসুস্থ ঐতিহাসিক বিকাশের মলিন অধ্যায় ও ইতিহাসের এক বিপজ্জনক মিথ্যা-উদ্ভাবন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হোক।

তাছাড়া, এই বাস্তব ঘটনাকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমে বিগত দিনের শত্রুরা ভ্রাতৃপ্রতিম হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক বন্ধুত্বের পথে বিরাট পদক্ষেপ ফেলেছে। হেলসিঙ্কিতে ৩৫টি দেশের ইওরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং ইওরোপের দেশগুলিও তাদের ঐতিহাসিক রেষারেষি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। সেখানে এক নতুন দূরদর্শিতার ভারসাম্য আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিম আজ ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির এই কথাগুলির মূল্য উপলব্ধি করছে: "পাঁচিল তুলে নিরাপত্তা লাভ করা যায় না, তা পাওয়া যায় দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে।"

এটা সত্য যে বিরোধ দূর করার প্রক্রিয়াটি খুব সহজ না হতে পারে, তবু এটাই একমাত্র প্রক্রিয়া যা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও আপস আলোচনার ক্রম-বিকাশমান কলাকৌশলের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতিকে সহজ ক'রে তুলতে পারে। আশা করা যায় যে দু'দেশের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এই কাজে অগ্রণী হবে। স্যামুয়েল জনসন বসওয়েলকে বলেছিলেন, "মানুষের উচিত তার বন্ধুত্বকে ক্রমাগত সংস্কার করা।" ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলার সুযোগ যে এসেছে সে রকম ইঙ্গিতবাহী কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি এই রকম একটি লক্ষণ দেখা গেল যখন জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের সহ-সভাপতি শ্রীমতী তারা আলি বেগকে অতি সহজেই চীন তার দেশে ভ্রমণের অনুমতি দিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে খুব কম ভারতীয়ই চীনে গেছেন। সাধারণতঃ কূটনৈতিক মহলে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী কিছুই শ্রীমতী তারা আলি বেগ দেখেছেন। চীন ও তার জনগণ, চীনের নতুন আত্মবিশ্বাস, তার উদ্যমপূর্ণ উৎপাদনশীলতা, পরনির্ভরশীলতার অবসান ইত্যাদি—যেগুলি বিশ্ব, এশিয়া বিশেষতঃ ভারতের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয় সেগুলি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার উল্লেখ ক'রে প্রশংসার সুরে তিনি বলেন: "উপযুক্ত সময়ে ও অত্যন্ত বাস্তব অভিপ্রায়েই বাঁশের পর্দা তুলে নেওয়া হচ্ছে।" নতুন দেশ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রচেষ্টার প্রশংসা ক'রে তিনি আরও বলেন:

এটা হ'ল এক কর্মচঞ্চলতার যুগ—যেখানে দৈনন্দিন কাজের তালিকা থেকে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার মতো সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এটা আবার এক গোঁড়ামির যুগও বটে—যেখানে চলেছে ক্রমাগত নৈতিক বক্তৃতা আর আলোচনা এবং সমস্ত ছাত্রদের কর্মসূচীতে রয়েছে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার 'নৈতিক' পাঠ। সফরকালে অনেক সময় আমার কাঁধে একটি পাতা ঝরে পড়লেও—কোন কোমল হাত তা সরিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র আশ্চর্যজনক উঁচুমানের পরিচ্ছন্নতা এক আনন্দের বিষয়রূপে বিরাজমান। কোথাও একটা মাছি পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। যেভাবে সাধারণের বাড়িগুলি, রাস্তাঘাট এবং সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা-গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাতে মনে হয়—এ সবের মধ্যে রয়েছে যেন এক জাতীয় গর্ব। শিশুদের আরও বেশী কাজ করতে—যৌথ দায়িত্ব উপলব্ধি করতে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে চীন আজ এক সদর্থক, গতিশীল সমাজ গড়ে তুলছে যেখানে কোনকিছুই পিতৃতান্ত্রিক স্তরের দয়া-দাক্ষিণ্যের বস্তু নয়।[৮]

টাইমস অব্ ইণ্ডিয়ার একটি রিপোর্ট অনুসারে শ্রীমতী বেগ আরও দেখেছেন, "চীনে কৃষকদের জীবন হয়ে উঠেছে অদ্ভুত রকমের গান্ধীবাদী।" "জীবন সেখানে ভদ্র ও শান্তিময়....একটি শিশুও সেখানে ক্ষুধার্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত নয়... তরুণেরা অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস...তাদের চরিত্রে যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হ'ল জীবনের ইতিবাচক দিকটির প্রতি ভালবাসা এবং তাদের অস্তিত্বকে আরও উন্নত ক'রে তোলার প্রচেষ্টা।" একই রকম ভাবে চীন সফরান্তে কলকাতার ডঃ বসু দৃঢ়তার সাথে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের জনগণের উচিত চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে আরও বেশী ক'রে জ্ঞান অর্জন করা।

পরীর দেশের নানা কাহিনী শুনে অনুপ্রাণিত ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীহরিশ চানদোলা সম্প্রতি যখন চীনে যান, তখন তিনি শিশুর মত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সে দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে চীনের প্রকৃত ইতিহাস বিরাট বিরাট রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস ততটা নয়, যতটা হ'ল দলে দলে সুপ্রাচীন কৃষিজীবী মানুষের প্রাচীন বাসভূমি পীতনদীর উপত্যকার মধ্যাঞ্চল থেকে সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে বসতি স্থাপনের ইতিহাস। চীনা ইতিহাসের নাটকে বড় বড় সম্রাট বা জেনারেলরা নায়ক নন, এমনকি রাজকীয় চীনের 'সিল্কের পর্দার

পিছনে ফুলের ছায়া' নামে পরিচিত বিখ্যাত সুন্দরীরাও নন। বরং যেসব নামহীন কৃষকেরা নিজেদের জন্মভূমি থেকে যাত্রা শুরু ক'রে বহুদূরে খণ্ড খণ্ড জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়ে সেখানে বাসস্থান তৈরি করেছিল, তারাই হ'ল প্রকৃত অভিনেতৃবৃন্দ। তিনি আরও বলেন, চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস এই ধরনের ঘটনার শেষস্তর, যে স্তরে সুদীর্ঘ শতাব্দী পরে কৃষকেরা অবশেষে চীনের ভূমিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল এবং পুরাতন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুরু করল পরিবেশের সেই পুনর্মূল্যায়ন, যা এক নতুন প্রাচুর্যময় বিশ্ব সৃষ্টির পথ প্রশস্ত ক'রে তুলবে।[৯] অবশ্য, এই প্রাচুর্য অপরকে লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জন করা হবে না,—সাধারণ চীনবাসীর মানসিকতা পর্যবেক্ষণ ক'রে লেখক এই মন্তব্য করেছেন। তাদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল সাধারণ ভদ্রমানের জীবন যাপন করা, যেখানে থাকবে না কোন ধনী এবং কোন উপবাসী। চীন কিংবা বিশ্বসংসারের অন্য যে-কোন জায়গার মানুষকে শোষণ ক'রে প্রাচুর্য বা উন্নতি লাভ করা তাদের চিন্তা বা পরিকল্পনায় ঠাঁই পায়নি; মানবিক ঐক্যচেতনা চীনে এক শক্তিশালী চালিকা শক্তি।[১০]

কিন্তু হরিশ চান্দোলা তাঁর স্বল্পকালীন চীন ভ্রমণে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে তথ্যটি উল্লেখ করেন সেটি হ'ল যেসব অফিসারদের সাথে তাঁকে মিশতে হয় তারা সমেত সকল চীনাই ছিল অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। আমি এমন একটা দেশ থেকে গিয়েছিলাম যার সাথে সেই মুহূর্তে চীনের সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাই বলে আমার বিরুদ্ধে কোন রকম বৈষম্যের কোন চিহ্নই সেখানে ছিল না।"[১১]

সম্পর্ক উন্নত করার আরেকটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা হ'ল কে. পি. এস. মেনন ও জনৈক উচ্চ-সম্মানিত বিশিষ্ট চৈনিক ভদ্রলোকের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পত্রালাপ। সেই উচ্চপদস্থ চৈনিক সরকারী কর্মচারীর আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রত্যুত্তরে উৎসাহিত হ'য়ে কে. পি. এস. মেনন মন্তব্য করেন:

আশা করা যাক যে এমন একদিন আসবে যখন চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আমরা গর্ব বোধ করতে পারব। অবশ্য, এটা আশা করাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য আমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি, দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জীবন-মরণ সমস্যাগুলিকে টেনে আনার লোভ আমাদের সংবরণ করতে হবে।[১২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনগণের রয়েছে এক বিশেষ দায়িত্ব। চিরস্থায়ী ঘৃণা কাকে বলে তা তারা জানে না; শত্রুতাকে সব সময় চাঙ্গা অবস্থায়

জিইয়ে রাখা যায় এমন বিশ্বাস তাদের নেই। ঘৃণা করার চেয়ে ভালবাসা তাদের পক্ষে সহজতর। এবং বাস্তবিক পক্ষে, তাদের সরকারী প্রতিনিধিরা চীন-ভারত সীমান্তে বরফ গলাবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে সামনে রেখে চীনের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলার চেষ্টা ভারত অতীতেও করেছে এবং এখনও করছে। অস্ট্রেলীয় ব্রড কাস্টিং কমিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭৩-এর ২রা জুন শ্রীমতী গান্ধী এই মর্মে বিশেষ গুরুত্বের সাথে মন্তব্য করেন যে, কয়েকটি দেশ এতগুলি বছর ধরে চীনকে "অগ্রাহ্য" করে ভুল করেছে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আরও 'বাস্তব' মনোভাব নিলে অনেক সমস্যাই এত তীব্র হ'য়ে উঠত না। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন যে এশিয়ার অধিকাংশ দেশই একই ধরনের সাধারণ সমস্যাবলীর সম্মুখীন এবং "উসকানিমূলক মনোভাব বা উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা কোনকিছুরই সমাধান হয় না।" তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে চীনারাও এশিয়ার বাস্তবতার সম্মুখীন হবে ও একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।[১৩] তিনি একথাও বলেন, "আমরা কখনওই চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিনি।"[১৪]

তাঁর যুগোস্লাভিয়া সফরের প্রাক্কালে বেলগ্রেড টেলিভিশনের ডঃ বরিভজিমির কোভিক প্রশ্ন করেন যে, তিনি বা বহির্বিষয়ক মন্ত্রী যে আশা প্রকাশ করেন সে সম্পর্কে চীনের কাছ থেকে কোন সমর্থক প্রত্যুত্তর পাওয়া গিয়েছিল কিনা। শ্রীমতী গান্ধী জবাবে বলেন: দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা অনেক সহজ হয়েছে···আমরা আশা করি স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থার আরও উন্নতি হবে।"[১৫] অটোয়াতে আর এক অনুষ্ঠানে তিনি পুনরায় বলেন, চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আমরা যখনই সুযোগ পাচ্ছি, তখনই চেষ্টা করছি।[১৬]

ভারতের প্রতি চীনের সমঝোতার মনোভাব

ভারতের পক্ষ থেকে সমঝোতার আহ্বান বৃথা যায়নি। চীনও ১৯৭৩ সালের ১৩ই জুন ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি সমঝোতার মনোভাব নেয় এবং বলা হয়, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যেকার মতবিরোধের যুক্তিযুক্ত সমাধানের এখন সম্ভাবনা আছে। একথাও বলা হয়, "বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার মতবিরোধগুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা উচিত।" চীনা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সিনহুয়া তার প্রচারিত সংবাদের কোথাও ভারতের বা ভারতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে

কোন ক্ষতিকর মন্তব্য করেনি। সেই প্রথম সে বাংলাদেশকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে অথবা "পূর্ব পাকিস্তান" বলেও উল্লেখ করেনি। ঐভাবে সে ইঙ্গিত দিল যে যুদ্ধবন্দীদের বিষয়টি মিটে গেলেই, চীন হয়ত পাকিস্তানের ভূতপূর্ব পূর্ব-অংশটিকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেবে। চীনের ব্যক্তিগত পর্যায়ের আশ্বাস সম্পর্কে এমন সংবাদও পাওয়া গেছে যে, ভারত-পাক সমস্যাগুলির আপস মীমাংসা হ'য়ে গেলেই পিকিং চীন-ভারত সৌহার্দের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরী।[১৭]

কিছুদিন আগে স্টেটস্‌ম্যানের আবাসিক সম্পাদক কুলদীপ নায়ার তাঁর "বিট্‌উইন দি লাইন্‌স" শীর্ষক প্রবন্ধে চীনের পরোক্ষ হাবভাবের উল্লেখ ক'রে বলেন, ঐ সব থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সে ভারতের সাথে পুরাতন বন্ধুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চায়।[১৮] ভারত সরকারের উচিত ঐসব ইঙ্গিতের সদর্থক প্রত্যুত্তর দেওয়া এবং ভারতের স্বার্থে গঠনমূলক উদ্‌যোগ নেওয়া। যদি রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রশ্নগুলি বর্তমানে আলোচনাসাধ্য না হয় তাহলে বাণিজ্যিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হোক না কেন? বোড়ের চতুর চাল হিসেবেই বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হোক না। কারণ, এতে কোন অপমান ঘটবে না এবং এটি অপর পক্ষকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে প্রতিভাত হবে না। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে পিকিং-এ রাষ্ট্রদূত পাঠানো যেতে পারে।

চীনারা সম্প্রতি এক অভিযোগ করেছে (পিকিংস্থ "দি লণ্ডন টাইম্‌স" ও "দি ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সংবাদদাতাদের ১৯৭৩ সালের ১লা অগস্ট) যে ভারতীয়রা এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে পাকিস্তানকে খতম করার জন্য মস্কোর প্রচেষ্টাকে আপাত সমর্থন দিচ্ছে; এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত ভারত-পাক আলোচনার ফলাফলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসত্য প্রকাশ পেয়েছে। ঐ আলোচনায় পাকিস্তান নিজেই স্বীকার করেছে যে, ১৯৭১ সালের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা একটা নির্ভুল এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভয় হয়, এই ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচার নিয়ে চীনের মাতামাতি ভারত ও চীনের মধ্যেকার সম্পর্ককে স্বাভাবিক ক'রে তোলার সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দেবে। উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি, বিশেষ ক'রে পাকযুদ্ধবন্দীদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় পর এই সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান। অবশ্য, সম্প্রতি চীনের সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী ও নিউইয়র্কস্থ ভারতীয়

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে একটি বৈঠকের ফলে দু'দেশের সম্পর্কের এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে বলে মনে হয়।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য কাউলের চেষ্টা

সম্প্রতি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছে। ওআশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাউল দু'দেশের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ ক'রে বলেন: "এটা আমাদের আশা ও কামনা যে আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।" তিনি বলেন, দুটি দেশ যেসব মূল্যবোধ ও আদর্শ পোষণ করে এবং যেগুলি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল সেগুলি "বর্তমানের সাময়িক মতবৈষম্যের" চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন: "উপমহাদেশের নতুন বাস্তব অবস্থা আপনাদের সরকার মেনে নিয়েছেন ও সিমলানীতির প্রতি আপনারা সমর্থন জানিয়েছেন—এই ঘটনাকে আমরা স্বাগত জানাই।"[১৯]

নিক্সনও নতুন সম্পর্ক চান

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন সেদেশে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত টি. এন. কাউলকে (যিনি ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুন পরিচয়পত্র পেশ করেন) বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন উপমহাদেশে প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব বর্তায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উপর। শ্রীনিক্সন বলেন যে, সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলা সহজসাধ্য না হলেও, অতীতের দ্বন্দ্বগুলিকে দূর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ পরিষ্কার করার নতুন উদ্‌যোগ নেবার জন্য ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির দৃঢ়তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহিত হয়েছিল। শ্রীনিক্সন আরও বলেন, শ্রীকাউল দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তিনিও সেই ইচ্ছাই পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন, "আমাদের দিক থেকে আমরা দুটি দেশ ও জনগণের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারতের সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাব।"[২০] নিক্সন তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন: "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী স্বার্থ নেই। অতীতে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, স্বাধীন, প্রগতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ এক দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিষ্ঠায় ভারতের সাথে আমরাও একই সাধারণ স্বার্থের অংশভাগী এবং এটাই

ভবিষ্যতের পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তি হবে।" তিনি বলেন যে ১৯৪৯ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন: "বিশ্বঘটনাবলীতে ভারত অবধারিতরূপেই এক গুরুত্বপূর্ণ দেশ হতে চলেছে।" ভারতের পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা তাঁর ধারণাগুলির ন্যায্যতা প্রমাণ করেছে। "আমার বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি বলেছিলাম যে ভারতকে আমরা একটি প্রধান দেশ হিসেবে সম্মান করি এবং পারস্পরিক ভিত্তিতে ভারতের সাথে তার মর্যাদা ও দায়িত্ব অনুসারে ব্যবহার করার জন্য আমরা তৈরী। ২টি গণতান্ত্রিক দেশরূপে আমরা মহান ও মানবিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অংশভাগী। আমরা এটাও জানি যে আমাদের সম্পর্ক সংবেদনে নয় বাস্তবের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হতে পারে এবং তা পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি সম্মান দেখাবে," শ্রীনিক্সন এই উক্তি করেন।

পরের দিন শ্রীকাউল পুনরায় আশা প্রকাশ করেন যে দক্ষিণ এশিয়ার নতুন বাস্তবতার ভিত্তিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তিনি প্রশংসা ক'রে বলেন যে, পরিচয়পত্র পেশ করার অনুষ্ঠানে রিচার্ড নিক্সনের মন্তব্যগুলি ছিল "বন্ধুত্বপূর্ণ, সদর্থক ও বাস্তব।"[২২]

নিক্সনের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পত্র

শীঘ্রই দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনার আরও কিছু চিহ্ন দেখা গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মন্ট্রিল থেকে (কানাডা সরকারের আমন্ত্রণে যেখানে তিনি সরকারীভাবে সফররত ছিলেন) ১৯৭৩এর ২২শে জুন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনকে এক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র পাঠান। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি. এন. কাউল মারফত ১৯৭৩এর ২২শে জুনের ঐ চিঠিটি ছিল ২১শে জুন শ্রীমতী গান্ধীর প্লেসিড হ্রদ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে শ্রীনিক্সন প্রেরিত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর।

শ্রীকাউল ওআশিংটনে ২২শে জুন সাংবাদিকদের বলেন যে শ্রীনিক্সনের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর একটি ব্যক্তিগত পত্র তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। চিঠির বক্তব্যে নিক্সন-প্রেরিত পত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরই ধ্বনিত হয়।

ইতিপূর্বে নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে কানাডীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমানে উড়ে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পুরাতন বন্ধু শ্রীমতী কাইলের সাথে দেখা করতে যান। ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীময়নিহানও প্লেসিড হ্রদে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় ও মার্কিন উভয় কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরাই বিশ্বাস করেছিলেন যে

"মন-কষাকষির" অবসানপর্ব শুরু হয়েছে এবং দু'দেশের নেতৃবৃন্দই ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে সেই পুরাতন বন্ধুত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। শ্রীকাউল শ্রীমতী গান্ধীর সাথে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা সেরে ১৯৭৩এর ২১শে জুন ওআশিংটনে প্রত্যাবর্তন করেন। মনে হয় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অতি সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলার পর প্রশস্ত করার বিষয় নির্দেশ নেওয়ার জন্য তিনি মন্টিুলে যান।[২২]

আশা করা যায় যে শ্রীকাউল মার্কিন দেশে তাঁর পূর্বসূরী শ্রী এল. কে. ঝা যে ধরনের "কিছুটা ঝোড়ো" অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সহজ—এবং কাশ্মীরের ডাল হ্রদের শান্ত জলরাশির মতই —শান্ত পরিস্থিতি পেয়েছেন।[২৩]

একটি নতুন লক্ষণের সংযোজন

পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারতের সন্দেহকে প্রশমিত করার জন্য নিক্সন-প্রশাসনের আগ্রহের মধ্য দিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার কয়েকটি লক্ষণ দেখা গেল। সম্প্রতি যখন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ভারতের সমমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার জন্য আমেরিকার কাছ থেকে আরও অস্ত্র দাবি করলেন, তখন সাধারণতঃ "কোন মন্তব্য নয়"—এই ধরনের বিবৃতি দানই ওআশিংটনের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এই সময় ভারত-মার্কিন সম্পর্ক যাতে আরও খারাপ না হয় সেজন্য নিক্সন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হলেন। পররাষ্ট্র দপ্তর সাধারণভাবে এটা বুঝাতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের গতানুগতিক বিবৃতি শুধুমাত্র ভারতের সন্দেহই জাগিয়ে তুলবে এবং যেটা ছিল সম্ভবতঃ ভুট্টোর মনোবাঞ্ছা। তাই পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র পল হেয়ার নীতিগত অবস্থানের পুনারাবৃত্তি ক'রে বলেন যে আমেরিকা ভারত বা পাকিস্তান কাউকেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবে না, এবং শুধুমাত্র কম মারাত্মক ও আগে সরবরাহ করা সরঞ্জামের যন্ত্রাংশই বিক্রি করা হবে।[২৪] ভুট্টোর ওআশিংটন সফর স্থগিত হওয়াও পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের হৃদ্যতার অভাবই সূচনা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের অসুস্থতার জন্য নয়, রাজনৈতিক কারণেই সফর স্থগিত রাখা হয়েছিল। মনে হ'য়েছিল যে আমেরিকার নীতি ছিল পাকিস্তানকে বর্জন ক'রে ইরানের দিকে ঝুঁকে পড়া, কারণ ইরানের রয়েছে তৈলসম্পদ আর অস্ত্র কেনার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা।[২৫]

অতএব আশা করা যায় নিক্সন প্রশাসন শক্ত দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার খেলা চালিয়ে যাবেন আর ওস্তাদ রাজনৈতিক বাজিকর পাক-প্রেসিডেন্ট ভারতের সন্দেহ বাড়িয়ে তোলার জন্য যে-কোন ব্যবস্থা ও পথ ব্যবহার করবেন। নিক্সন-প্রশাসন স্বীকার করেন যে শ্রীভুট্টোর নতুন অস্ত্রশস্ত্র চাওয়ার যথার্থ ক্ষমতা ছিল কিন্তু তাঁরা এই মৌলিক পার্থক্য ও তথ্যটিও লক্ষ্য করেন যে ঘটনা-চক্রে পাকিস্তানের অবস্থিতি একেবারে ভারতের দোরগোড়ায়। এবং জনৈক ভারতীয় সাংবাদিকের ভাষ্য অনুসারে কোন এক মার্কিন মহল থেকে বলা হয়—তাঁরা (অর্থাৎ মার্কিন সরকার) জানেন, "আমরা যদি পাকিস্তানকে অস্ত্র-সাহায্য করতে শুরু করি ভারতও তখন তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করবে এবং পাকিস্তান পছন্দ করুক চাই না করুক [আমরা জানি] উপমহাদেশে ভারত প্রভাবশালী শক্তি।"[২৬]

কয়েকদিন পরে, নয়াদিল্লীতে ক্রিশ্চিয়ান ওআর্ল্ড সেমিনারের সদস্যদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী পুনরায় এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন যে ভারত ও আমেরিকা তাদের সন্দেহগুলি অপসারণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আমেরিকানদের ভারতের অবস্থা যা তাদের নিজেদের থেকে একেবারেই ভিন্ন—তার সাথে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানান।[২৭]

একই ভাবে কে. পি. এস. মেনন আমেরিকানদের ভারতের প্রতি জন ফস্টার ডালেসের অনুসরণ করা এবং উত্তরসূরীদের চালিয়ে যাওয়া নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন: বিপর্যয়কর ব'লে প্রতিভাত হয়েছে এমন নীতি অনুসরণ করার জন্য কোন সরকারই প্রায়শ্চিত্ত করবে এটা আশা করা যায় না। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে এবং ভুলে যেতে হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে।[২৮] তিনি আরও বলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্বেষ চিরস্থায়ী হতে পারে না। মার্কিন জনগণ এ বিষয়ে সচেতন হোন যে "বিশ্বে দুটি সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের" মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ পারস্পরিক সাহায্যের উন্নতির দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মার্কিন স্বার্থের লাভ করার মত রয়েছে সবকিছু এবং হারাবার মত কিছুই নেই।[২৯]

এবং দেখা যাচ্ছে যে মার্কিনীরা ভারতীয়দের এই ধরনের উক্তির প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। শোনা গেছে যে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিংগার রাষ্ট্রসংঘের বাৎসরিক অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান শ্রীস্বরণ সিংকে ওআশিংটন সফরের জন্য অনুরোধ জানান। যখন ১৯৭৩এর ৫ই অক্টোবর দুই উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রস্তাবিত বৈঠক বসল, কূটনৈতিক মহলে

তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেল। শুধুমাত্র যে নিক্সনের সাথে ভুট্টোর বৈঠকের একসপ্তাহ পরেই এটা ঘটল বলেই নয়, ভারত-পাক সামরিক সমকক্ষতার বিষয়টি* ওআশিংটন পছন্দ করেনি বলেও ঐ বৈঠক এক বিশেষ তাৎপর্য পেল।

তাছাড়া, নতুন পদে মনোনীত হওয়ার পরেই ডঃ কিসিংগার ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন বৈদেশিক নীতির ভারসাম্যহীনতার উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা এবং সম্ভব হ'লে ত্রুটিমুক্ত করার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান। তাছাড়া, নতুন পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সামনে হাজির হ'য়ে ডঃ কিসিংগার বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান অস্ত্র সরবরাহ-কারী থাকবে না। তিনি সেনেট কমিটিকে আশ্বাসও দেন যে ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ক্রমশই উন্নত হচ্ছে।[৩০]

অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা

মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশকালে কূটনৈতিক মতবিনিময় প্রসঙ্গে শ্রীকাউল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি নিয়ে কথা বলেন।

তিনি ব্যবসা, বাণিজ্য সংস্কৃতি, গবেষণা, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্প ও কৃষির উন্নতির বিষয়ে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা যায় বলে উল্লেখ করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণকালে শ্রীনিক্সনও ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দুটি দেশই ভারতের স্ব-নির্ভরতার পথে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী।

তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়া ও অন্যান্য উন্নয়নশীল অঞ্চলে মার্কিন উন্নয়ন সাহায্য, ব্যবসা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার প্রশ্নে মার্কিন ভূমিকার রয়েছে এক "বিস্তৃত বিষয়সূচী"। তিনি এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করা যাবেই।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আরও বলেন: "অর্থনৈতিক দিকে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের জন্য এক নতুন ভিত্তি স্থির করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" রাষ্ট্রদূত মহাশয়, আমি আশ্বাস দিতে চাই যে দুই মহান দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার যে ইচ্ছা আপনি ব্যক্ত করেছেন আমি ও আমার সরকার সেই একই ইচ্ছা পোষণ করি।"[৩১]

এই ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ মতবিনিময় থেকে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ইচ্ছুক। সেদেশের কিছু রক্ষণশীল লোকের নঞর্থক মনোভাব সত্ত্বেও, ওয়াকিবহাল মহলের মতে সাহায্য, বাণিজ্য ও ঋণ মকুবের বিষয়ে সাধারণ মার্কিন মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ ও অনুকূল।* এটা লক্ষণীয় যে ১৯৭৩ সালের ২৩শে অক্টোবর ইউ এস ওভারসিজ ডেভেলপমেণ্ট কাউনসিল পরিচালিত এক জাতীয় সমীক্ষা অনুসারে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই মার্কিন উন্নয়ন সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে প্রভূত আনুকূল্য লাভ করেছে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে শতকরা ৩৮ জন মার্কিন উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'তে রাজী না হলেও, আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের মনোভাব নঞর্থক নয়।

বিগত বছরগুলিতে এড ইণ্ডিয়া কনসরটিয়াম-এর বৈঠকগুলি মার্কিন মনোভাবের জন্য ছিল অনিশ্চয়তার মেঘে আবৃত। এই বছর, অবশ্য, ওআশিংটন ইতিমধ্যেই তার সাহায্যের পরিমাণ ৭৫ মিলিয়ন ডলার হবে ব'লে ইঙ্গিত দিয়েছে। গত বছরের শেষদিকে মার্কিন সরকার উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ঋণ মকুবে রাজী হয়েছেন।[৩২] ওআশিংটন আরও ঘোষণা করেছে যে সার, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, লৌহেতর ধাতু ও অন্যান্য জিনিসের আমদানির জন্য ৮৭·৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য কাজে লাগাবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হ'ল।

পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ডের একটি বড় অংশ খারিজ করা হবে

গত দু'দশক ধ'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য কেনা বাবদ পি. এল. ৪৮০ ঋণের খাতে ২৮০০ কোটি টাকা ব্যবহারের জটিল সমস্যাটির সমাধানের বিষয়ে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই এগিয়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যঋণের একটা বড় অংশ মকুব ক'রে দেওয়ার কথা ভাবছেন। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল পি. ময়নিহান সম্প্রতি এই সমস্যার অনুকূল সমাধান করার জন্য ওআশিংটনে যান।[৩৩] কিছুদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে একটি বিশেষজ্ঞ দলের পর্যালোচনায় এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে (পি. এল. ৪৮০) জমা টাকা বাতিল করার পথ হ'ল ঐ টাকার কিছুটা অংশ খারিজ করা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও টাকা খরচ করার অনুমতি দেওয়া। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেমণ্ড সোলনিয়ের এই সুপারিশ করেন।[৩৪]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে শ্রীময়নিহান ১৯৭৩এর ১৭ই জুলাই যখন শ্রীমতী গান্ধীর সাথে দেখা করেন, সেই সময় তিনি বিষয়টি সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গী ভারত সরকারের কাছে উপস্থিত করেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্যের আশু প্রয়োজন ও গতিপ্রকৃতির ওপর মার্কিন প্রস্তাবগুলির প্রভাবের ভিত্তিতেই সম্ভবতঃ ভারত সরকার সেগুলি বিচার-বিবেচনা করবেন।

শ্রীময়নিহান ভারত-মার্কিন সম্পর্কের চারটি দিক সম্পর্কে ওআশিংটনের মতামত জানাতে চান:

(১) পি. এল. ৪৮০ খাতে জমা টাকার হস্তান্তর,

(২) ভারতে ২১ বছরের পুরাতন মার্কিন সাহায্যের কার্যপ্রণালী বন্ধ করা;

(৩) এড কনসর্টিয়ামের মাধ্যমে ভারতের প্রাপ্তিযোগ্য মোট ঋণে মার্কিন অনুদানের সম্ভাবনা;

(৪) দুটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপ।[৩৫]

শ্রীময়নিহান ভারতের পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধরের সাথেও পি. এল. ৪৮০ খাতে জমা টাকার বিষয়ে অনেকগুলি বৈঠক করেন।

মার্কিন দূতাবাসের সূত্রে বলা হয় শ্রীমতী গান্ধীর সাথে শ্রীময়নিহানের আলোচনার সময় "ভারতকে শস্য সরবরাহ করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়।[৩৬]

শ্রীময়নিহান শ্রীমতী গান্ধীর সাথে তাঁর আলোচনাগুলিকে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে গঠনমূলক ব'লে বর্ণনা করেন।[৩৭]

শোনা যায় যে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরকারী স্তরে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাহায্যগত যে আলোচনা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল উভয়ের পক্ষেই উপকারী হয় এমন সব পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা।[৩৮]

কয়েকটি নতুন অগ্রগতি অবস্থাকে সহজ ক'রে তুলতে আরও সাহায্য করেছে। ১৯৭৩এর ১৪ই জুলাই ওআশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও উচ্চপদস্থ মার্কিন সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল--উপমহাদেশ, পি. এল. ৪৮০ কাণ্ডের জমা টাকার হস্তান্তর, ঋণের নতুন পরিকল্পনা এবং ভারতকে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সাহায্য।

শ্রীকাউলও ডঃ কিসিংগারের সাথে দেখা করেন। তাদের মধ্যে একঘণ্টা-

ব্যাপী আলোচনায় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের কথাও ওঠে।[৩৯] ঐ দিনেই শ্রী কাউল বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সাথেও দেখা করেন।[৪০]

পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ড সম্পর্কে সাময়িক চুক্তি

এ বিষয়ে যেসব সাম্প্রতিকতম তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ৩০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের বিষয়টি নগদ ১০০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে এবং ভারতে মার্কিন সংস্থাগুলির ব্যবহারের জন্য ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে সাহায্যের খাতে ৯০০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে মিটিয়ে নিতে সাময়িকভাবে রাজী হয়েছে। এই প্রস্তাবটি ভারত সরকারই করেছেন। প্রস্তাবের শর্তানুসারে অবশিষ্ট ২০০০ মিলিয়ন ডলার কৃষি উন্নয়ন, গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাসস্থান তৈরি ও অন্যান্য ভারতীয় পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা হবে। প্রস্তাবের আরও একটি শর্ত হ'ল নগদ ১০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়া আর সবটুকুই থাকবে টাকার অঙ্কে।[৪১]

সেনেটের বিপথে পদক্ষেপ

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য যে চেষ্টা চলছিল তা কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। যদিও খুব ধীর গতিতে ও নীরবে এদিকে কিছুটা অগ্রগতি ঘটছে, তবে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম তিক্ততার বিষয় সেই পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ডের[৪২] প্রশ্নটির সমাধানের মধ্য দিয়ে এদিকে একটা বড় রকমের অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করা গিয়েছিল।

কিন্তু মার্কিন পি. এল. ৪৮০ বাবদ অর্জিত অর্থের (আমেরিকার গম ভারতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ) লেন-দেন বিষয়ক চূড়ান্ত মীমাংসা সংক্রান্ত ভারত-মার্কিন খসড়া চুক্তি মার্কিন সেনেটে বাতিল হওয়ার ফলে সেই আশায় কিছুটা ছাই পড়েছে।

চিলির রাষ্ট্রপতি সালভাদর অ্যালেন্দের হত্যার জন্য মার্কিন সি. আই. এ. দায়ী ব'লে শ্রীমতী গান্ধীর পরোক্ষ উল্লেখ সেনেটের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ ব'লে ওআশিংটন থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চিলির বিষয়ে ভারতের মনোভাব দেখে সেনেট ক্রুদ্ধ হন। এবং সেনেটে পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ডের বিষয়টি নিষ্পন্ন করার বিরুদ্ধে ৬৭—১৮ ভোট পড়ে।[৪৩] রিপাবলিকান দলের রক্ষণশীল সেনেটর ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের বিরোধিতা ক'রে বলেন, "সাম্প্রতিক কালে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখায় নি। আমার মনে হচ্ছে যে এটা বোধহয় বন্ধুত্ব ক্রয় করার একটা প্রচেষ্টা। আমার অভিজ্ঞতা হ'ল আমরা বন্ধুত্ব কিনতে পারি না।[৪৩(ক)]

কাণ্ডের সমস্যার মধ্যে বাইরের বিষয়গুলি ঢুকিয়ে দেওয়া সুস্থ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পক্ষে বিপর্যয়কর। এই নঞর্থক ভাবভঙ্গীর প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। মার্কিন বুর্জোয়া একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দালালেরা সমাজতান্ত্রিক ভারতের সুস্থ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নয় বলেই মনে হয়।[৪৩(খ)] বস্তুত পক্ষে, ইতিহাসের চাকাকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক গতিপথের বিপরীত দিকে চালাবার কোন অপচেষ্টা থেকেই তারা বিরত হবে না। তাদের জঘন্য ও ক্ষতিকারক পরিকল্পনার স্বতঃ-প্রকাশ ঘটেছে চিলিতে ফ্যাসিস্ট জুন্টাদের দ্বারা সালভাদর অ্যালেন্দের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত সাধনের মধ্য দিয়ে। সেখানকার সামরিক ডিক্টেটরদের তারা বিরাট অঙ্কের ঋণ দিতে রাজী হয়েছে সহজেই এবং এর উদ্দেশ্য হ'ল সেখানে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম ক'রে সেখানকার তামার খনিগুলি থেকে ক্রমে ক্রমে আবার নয়া উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি আদায় করা। ঐ সব খনিগুলি থেকে ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক সরকার মার্কিন পুঁজিপতিদের তল্পি-তল্পা সমেত দূর ক'রে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে—"ঐ মহিলাটি", "ঐ পরিতাপজনক মহাশয়," ইত্যাদি যেসব কথা বলছেন তা থেকে এ বিষয়ে সন্দেহ জাগে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও ভাল হবে কিনা।

জোট-নিরপেক্ষতা ও তার সুফল

জোট-নিরপেক্ষতা আঁকড়ে থাকার সুফল ফলেছে। এড ইনডিয়া কন-সরটিয়াম সম্প্রতি ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য মোট ১২০০ বিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে রাজী হয়েছেন। কনসরটিয়ামের সিদ্ধান্ত আসলে বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশেরই অনুমোদন। ঐ সুপারিশের মর্ম ছিল—পরিকল্পনা-বহির্ভূত ৭০০ মিলিয়ন ডলার ও পরিকল্পনা খাতে ৫০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দান। পরিকল্পনা-বহির্ভূত সাহায্যের মধ্যে ঋণ পরিশোধ ছাড়াও কিছুটা সুবিধা দানের ব্যবস্থাও থাকবে। নীট সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। সাহায্যের বাকী অংশ দিয়ে পুরোনো ঋণ পরিশোধ করা হবে। কনসরটিয়ামের দুদিনব্যাপী বৈঠকে অধিকাংশ সদস্যরা এমন ইঙ্গিত দেন যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ পরিশোধে সুবিধা দান সমেত এইসব সাহায্যের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে তাঁরা সমর্থ হবেন। অন্যান্য সদস্যরা বছরের

শেষের দিকে এটা করতে সমর্থ হবেন ব'লে আশা প্রকাশ করেন এবং সমগ্র কর্মসূচীটির প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান।

জানা গেছে কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র আরও বেশী অর্থ মঞ্জুরির প্রতিশ্রুতি দেবেন। এই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্স ; বেলজিয়ামও কিছু দেবে। জাপানের ঋণ হবে বড়সড় রকমের।

আলোচনাকালে কনসরটিয়ামের সদস্যরা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার, বিশেষতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সামাজিক লক্ষ্যের প্রশংসা করেন।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিষদ্ I D A) ভারতকে বাইরের সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে সাহায্য করছে। জানা গেছে বিশ্বব্যাঙ্ক নাকি তার সাহায্য নিয়ে নির্মীয়মাণ গঠনমূলক প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক টেণ্ডার ডাকার জন্য জেদ করছেন। কিন্তু এই মন-কষাকষি সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখবেন ব'লে আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে, ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন ব্যাঙ্ক দুটি ঋণ বাবদ মোট ১৭০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। এদেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য এই ঋণ দেওয়া হবে।

৭০ মিলিয়ন ডলার অঙ্কের একটি ঋণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইন-ভেস্টমেণ্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া (I C I C I)-এর বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। এই সংস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পগুলিকে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে ঋণ দেয়।

ক্ষুদ্রশিল্পে আই-ডি-এ-এর ঋণ

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিষদ্ (International Development Association) ভারতের ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। নয়াদিল্লীতে ১৯৭৩-এর ২২শে জুন ভারতের ক্ষুদ্রশিল্প পরিষদ্গুলির ফেডারেশনে ভাষণদান প্রসঙ্গে আমদানি-রপ্তানির প্রধান নির্বাহক এস. জি. বসু-মল্লিক বলেন, ক্ষুদ্রশিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির উদ্দেশ্যে এই ঋণ দেওয়া হবে। শোনা গেছে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগী ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের মারফত এই ঋণ দেওয়া হবে।[৪৪]

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিষদ্ ১৯৭৩-এর ২২শে জুন আরও ঘোষণা করেন যে ভারতে একটি টেলিকমিউনিকেশন প্রকল্পে অর্থসাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা

কানাডিয়ান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সি আই ডি এ) ও হাঙ্গেরির সাথে যোগ দেবেন। আই ডি এ বলেন, এই প্রকল্পের জন্য তাঁরা ৮০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করেন। ভারতীয় অর্থনীতির এই শাখায় বিশ্বব্যাঙ্কগোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্ন সমর্থনের এটি পঞ্চমতম ঋণদান অনুষ্ঠান। আই ডি এ কর্তৃপক্ষের মতে প্রকল্পের জন্য খরচ পড়বে মোট ৫৩৪ মিলিয়ন ডলার এবং ভারতীয় পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম দুবছরের (এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে মার্চ ১৯৭৫ পর্যন্ত) খরচ যোগাবে।[৪৫]

মনট্রিলে কুইবেক টলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭৩-এর ২৩শে জুন শ্রীমতী গান্ধী কানাডার সাহায্যের "ধরন ও শর্তাদির" প্রশংসা করেন। ১৯৭৩-এর ২৯শে জুন কানাডার সংসদের উভয়সভার সদস্যদের কাছে ভাষণদান কালে শ্রীমতী গান্ধী কানাডার রাজনৈতিক সুবিধালাভের প্রত্যাশা-বিহীন সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বলেন, সবদেশ এতটা বোদ্ধা নয়।[৪৬] তিনি আরও বলেন, ভারত উভয় দেশের সুবিধার্থে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত ক'রে তুলতে চায়।[৪৭] এর কয়েকদিন আগে ১৯৭৩-এর ১৯শে জুন এক ভারতীয় মুখপাত্র শ্রী ট্রুডো ও শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের বৈঠকের পর বলেন যে, ভারত ও কানাডার মধ্যে শুধু আন্তজাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করাই নয়, উভয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পান।[৪৮]

পারস্পরিক সহযোগিতার এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা হয়; এবং ট্রুডোর ব্যক্তিগত সহকারী, আইভান হেড সংবাদিকদের কাছে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, কানাডার স্বার্থেই ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা দরকার, যাতে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ভিত্তিতে তারা আরও বেশী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।[৪৯]

দুই প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁদের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন সেই সময় দুই সরকারের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলি ও অন্যান্য বিষয়গুলি বিশদভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন।

পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনায় দুদেশের মধ্যে নিয়মিত পরামর্শের জন্য ভারত অন্যান্য বহু বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সাথে যেসব যুক্ত-কমিশনগুলি স্থাপন করেছে সেইরকম যৌথ-ব্যবস্থা স্থাপনের সম্ভাবনার বিষয়টিও স্থান পায়।[৫০]

এইসব সুস্থ অগ্রগতিগুলি জোট-নিরপেক্ষতার নীতির বিজয়ের ইঙ্গিতবাহী।

জাপানের সাহায্য

যুক্ত ইন্দো-জাপান অর্থনৈতিক কমিশন সম্প্রতি ১৯৭৩ সালের মধ্যভাগে টোকিওতে তাঁদের সুচিন্তিত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদল জাপ-প্রতিনিধিদলের কাছে ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করেন। জাপানীরাও ভারতকে পাঁচটি সার প্রকল্প স্থাপনের বিষয়ে সাহায্য করতে আগ্রহ দেখান। যদিও এই প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা টোকিও হয়ত দেবে না, তবে এটা আশা করা যায় যে জাপান এবছর অতীতের চেয়ে অনেক বেশী ইয়েন ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দেবে।

সম্প্রতি যে জাপ-অনুসন্ধানী দল ভারত সফর করলেন তাঁরা দ্বদেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে ব'লে আশা প্রকাশ করেন। তাছাড়া, প্রচুর বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জাপান সমুদ্রপারের বিক্রি কমিয়ে আনবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছে। আশা করা যায়, জাপান সেইসব সমুদ্রপারের বাজার, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার, (যেখানে সে প্রভাবশালী)-গুলিতে ভারতকে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা নীতির আলোকে এটি আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ যে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পিতার মতই সমগ্র চিরাচরিত 'প্রভাবের ক্ষেত্র' ও 'ক্ষমতার ভারসাম্য'-এর নীতিগুলিকে সমালোচনা করতে কখনও দ্বিধা করেন নি। তিনি মনে করেন, এই মনোভাব বিশ্বে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ভারত সবসময়ই এইসব ক্ষমতার প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থেকেছে এবং তার দেশে কখনও কোন বিদেশী শক্তিকে ঘাঁটি গড়তে দেয়নি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত কাউকেই তা করতে দেওয়ার কোন ইচ্ছাই তার নেই।[৫২]

প্রধানমন্ত্রী জোট-নিরপেক্ষতার নীতি তুলে ধরলেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৩-এর ১৭ই জুন বেলগ্রেডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জোট-নিরপেক্ষতাকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটাবার জন্য এক আন্দোলন রূপে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, ঘটনাবলী আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে জয়যুক্ত করেছে। জনৈক সংবাদদাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখন যেখানে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মন-কষাকষির অবসান ঘটবার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তখন জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির পালন করার মত

কোন নতুন ভূমিকা আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, জোট-নিরপেক্ষতা নেতিবাচক ধ্যানধারণা নয়। তিনি আরও বলেন, যদিও বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মন-কষাকষির অবসান ঘটেছে তবু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলি এখনও রয়ে গেছে নতুন নতুন দ্বন্দ্বগুলি থেকে উদ্ভূত অচলাবস্থার সমাধানের বিষয়ে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি এখনও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী চতুর্থ জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের (যেটি ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে আল-জেরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়)—তোড়জোড় সম্পর্কে আলোচনাতেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৫২]

সর্বোপরি, ভারত জোট-নিরপেক্ষতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, কারণ সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমেই শান্তি অর্জন করতে হবে এবং শুধুমাত্র শান্তির মাধ্যমেই বিশ্বসমস্যাবলীর সমাধান করা যায়।

ভারত সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বেই বিশ্বাস করে, তা সে তাদের নীতি ও সরকারের ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। দ্রুতপরিবর্তনশীল বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে এটা সবচেয়ে বেশী জরুরী।

তাছাড়া, জোট-নিরপেক্ষতা হ'ল একটি গতিশীল নীতি, কারণ কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায়/তা কঠিনের চেয়ে নমনীয় বেশী। স্বাধীন সিদ্ধান্ত-গ্রহণ এই নীতির এক মৌলিক শর্ত। সর্বোপরি, জোট-নিরপেক্ষতা অলঙ্ঘনীয় নয় এবং যদি তা মৌলিক জাতীয়স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা সংশোধন ক'রে নেওয়া যেতে পারে। জোট-নিরপেক্ষতার অন্ধ-অনুসরণ এই প্রাণবন্ত নীতিটির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১। সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ৩রা জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭ম কলম ; দি স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ৮ম কলম।

২। প্রাভদা ও ইজভেস্তিয়া (মস্কো), ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৫।

৩। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৮ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত।

৪। হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।

৫। এ. পি. জৈন সম্পাদিত শ্যাডো অব দি বিয়ার (নয়াদিল্লী), পৃঃ ৯৬৭-৭১এ অন্তর্ভুক্ত চুক্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬। ভারতে রাষ্ট্রদূতরূপে কার্যভার গ্রহণের প্রাক্কালে ১৯৭২-এর ২০শে ডিসেম্বর মিঃ ময়নিহান ক্রিশ্চান সায়েন্স মনিটর পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভারত-সোভিয়েত চুক্তিকে ভীতিপ্রদ মনে করেন নি।

তিনি বলেন, "এইসব সরকার (ভারত, রাশিয়া, চীন) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে বাধ্য। কারণ তারা (ভৌগোলিক দিক থেকে) খুবই ঘনিষ্ঠ।

৭ স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ২০শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ১ম কলম।

৮ তারা আলি বেগ, "হোয়াই চায়না ইজ লিফটিং দি ব্যাম্বু কার্টেন", সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ২২শে জুন ১৯৭৩, সাময়িকী বিভাগ, পৃঃ ১, কলম ১, ৪, ৫-৬। এঁর আরও একটি রচনা, "বেড গার্ডস অ্যাণ্ড পিংক অলিএণ্ডারস", ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লি অব ইণ্ডিয়া (বম্বে), ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, ভল্যুম XCIV, নং ৩৭, পৃঃ ৩৭-৪১ দেখুন। আরও দেখুন "চায়না : অ্যাজ ইণ্ডিয়ান উইমেন সি ইট", টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া উইক্‌লি (নয়াদিল্লী), ১২ই অগস্ট ১৯৭৩, পৃঃ ১ এবং ৩। এই অংশে তাঁর রচনায় শ্রীমতী তারা আলি বেগ পুনরায় মন্তব্য করেন : বাইরের সাহায্য ছাড়া দেশের মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদকে গড়ে তোলার চেষ্টা চীনকে শুধুমাত্র বিশ্ব-মর্যাদাই দেয়নি, তার জনগণের গর্ব ও মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতেও বিরাটভাবে সাহায্য করেছে। তারা গরীব হতে পারে—কিন্তু তারা অনেক বেশী তৃপ্ত ও গর্বিত ব'লে আমাদের মনে হয়। [ঐ, পৃঃ ৩, ৫ম কলম।]

৯। হরিশ চানদোলা, "অনওয়ে টু চায়না", ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ২৯শে অগস্ট ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ২ ও ১০ কলম।

১০। ঐ, ৩০ অগস্ট ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ১ম ও ৬ষ্ঠ কলম।

১১। ঐ, ৬ষ্ঠ কলম।

১২। কে. পি এস. মেনন, "সাইনো-ইণ্ডিয়ান রিলেশনস : অ্যান্‌ অ্যানালিসিস", দি মাদারল্যান্ড (নয়াদিল্লী), ৭ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৬, ৮ম কলম।

১৩ সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ৩রা জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭ম-৮ম কলম।

১৪ হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ৩রা জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ১ম কলম।

১৫। দি স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ৭ম কলম।

১৬। অটোয়ায় টেলিভিশন থেকে প্রচারিত 'প্রশ্নোত্তর' অনুষ্ঠানে মন্তব্য, হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নিউদিল্লী), ২৫শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, কলম ৭।

১৭। দি সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ১৯ অগস্ট ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ৪র্থ-৫ম কলম। এখন ভারত-পাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পিকিংও

আজিজ আহমেদের সম্মানার্থে প্রদত্ত এক ভোজসভায় ১৯৭৩-এর ৩০শে অগস্ট তার বৈদেশিক মন্ত্রীর এক বিবৃতি মারফত এই মতৈক্যে স্বাগত জানিয়েছে। অতএব এটা আশা করা যায় যে ভারত ও চীনের মধ্যে সৌহার্দ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা থাকা উচিত নয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হ'ল রাষ্ট্রপতি, যিনি সরকারীভাবে রোমানিয়া সফরে গিয়েছিলেন, রোমানিয়ার রাষ্ট্রপতি নিকোলাই চুসেস্কু তাঁকে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনের আগের থেকে অনেক বেশী সহজ ও স্বাভাবিক মনোভাবের বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার কথা জানান।

তিনি আরও বলেন তাঁর মূল্যায়ন হ'ল, অদূর ভবিষ্যতে চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলা সম্ভব হবে। [ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৬ই অক্টোবর ১৯৭৩, ৬ষ্ঠ-৭ম কলম]। রোমানিয়া ও চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে চুসেস্কুর ধারণার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করা চলে।

১৮। এই দৃশ্যপটের পিছনে যেখানে ভারতের চারপাশের দেশগুলি পিকিং-এর প্রত্যক্ষ মদতে শান্তি ও বন্ধুত্বের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেছে, সেখানে এমন একটা বিশ্বাস রয়েছে যে ভারতকে দূরে সরিয়ে রেখেই এই অঞ্চলে চীনের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে সাধিত হচ্ছে। যদি পিকিং নিজেই এখন মন-কষাকষির অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসে, তবে পরবর্তী কালে এই অঞ্চল থেকে পশ্চিমী নয়া-উপনিবেশবাদীদের প্রভাব খর্ব করতে সফল হবে। [কুলদীপ নায়ারের "ইনডিয়া, চায়না অ্যাণ্ড দি সোভিয়েট ইউনিয়ন", স্টেট্‌স্‌ম্যান, ২২শে নভেম্বর, ১৯৭৩।]

১৯। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৮, ৫ম কলম। একইভাবে ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীময়নিহানও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলার ওপর জোর দেন। ১৯৭২-এর ২০শে ডিসেম্বর ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর-এ তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়—"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার অর্থ হ'ল ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিকে অনুসরণ ক'রে যাওয়া। সেই নীতির ভিত্তি সামরিক বা অর্থনৈতিক নয়। তা হ'ল মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এক প্রবল ইচ্ছা—যেন গণতন্ত্ররূপে সে নিঃসঙ্গ না হয়।”

২০। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১ এবং ৮, ৭ম-৮ম ও ৫ম কলম। নিক্সনের মনোভাবের এই আকস্মিক পরিবর্তনের এক বিশেষ কারণ আছে ব'লে মনে হয়। তিনি এ তথ্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে ভারতে উৎকোচ দিয়ে গণ-বিশৃঙ্খলা ঘটাবার জন্য সি. আই. এ.-র সাম্প্রতিক নাশকতামূলক কাজকর্ম তেমন ফলপ্রসূ হয়নি, যতটা ১৯৫৩ সালে ইরানে মোসাদেগকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় হয়েছিল।

২১। ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৮, ২য়-৩য় কলম। বেলগ্রেড টেলিভিশনের ডঃ বোরিভোজ মিরকোভিক-এর সাথে শ্রীমতী গান্ধীর ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ওপর আলোকপাতকারী সাক্ষাৎকারটি দ্রষ্টব্য [দি স্টেট্‌স্‌ম্যান, (নয়াদিল্লী), ১৫ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭. ৮ম কলম]। দিল্লীর বহির্বিষয়ক মন্ত্রক প্রচারিত ১৯৭৩-এর ৮ই নভেম্বর মিসৌরির সেণ্ট লুইসে ওআর্লড অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল-এ কাউল-এর বক্তৃতাটি দ্রষ্টব্য।

২২। ঐ, ২৩শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৫ম কলম।

২৩। শ্রীনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৭৩-এর ২রা জুন ওআশিংটনস্থ ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত শ্রী এল. কে. ঝার বিবৃতি দ্রষ্টব্য [ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ৩রা জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ৭ কলম]।

২৪। হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ৭ই জুলাই ১৯৭৩।

২৫। শ্রীভুট্টোর প্রস্তাবিত মার্কিন ও ব্রিটেন সফর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া ও তাঁর খণ্ডিত পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব'লে সঠিক ভাবেই ১৯৭৩ সালের ১২ই জুলাই বন-এর ওয়াকিবহাল মহল বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে পাক জাতীয় সভার কাছ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তথাকথিত যে অধিকার চেয়েছিলেন তা আসলে বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং এটা বিশ্বাস করাবার জন্য যে তিনি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

কয়েকমাস পরে শ্রীভুট্টোর মার্কিন সফর পাকিস্তানের পক্ষে তেমন ফলপ্রসূ

হয়নি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুট্টোর অস্ত্রের সমকক্ষতার থিসিস বাতিল ক'রে দেন। ওআশিংটনে শ্রী এস. স্বরণ সিং ও ডঃ হেনরি কিসিংগারের মধ্যে আলোচনায় মার্কিনপক্ষ স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সামরিক সমকক্ষতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। [আরও বিশদ বিবরণের জন্য দি স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ৫ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭-৮ম কলম।]

পশ্চিমী পাক-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ভুট্টোর সফরের পিছনে ছিল যুগ্ম-উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা—আন্তর্জাতিক অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে ওঠা এবং পশ্চিমীদেশগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যোগাড় করা।

পশ্চিমী দেশগুলির রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা উপমহাদেশের পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া সম্পর্কে শ্রীভুট্টোর আন্তরিকতার বিষয়ে ছিলেন নিতান্তই সন্দিহান। তাঁরা অবশ্য ভেবেছিলেন, এটা হয়ত শ্রীভুট্টোকে সামরিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের বিষয়ে বোঝাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবলম্বন যোগাবে।

২৬। ইনডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ৯ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৮ম কলম।

২৭। মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ৩১শে জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, ১-২য় কলম।

২৮। কে. পি. এস্‌. মেনন, "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি নিউ অ্যাকসিস", সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ৬, ৮ম কলম।

২৯। ঐ।

* বিশদ বিবরণের জন্য দি হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ৫ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ১-৩য় কলম।

৩০। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ৫, কলম ১।

৩১। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৮, কলম ৬।

* রয়াল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি (লণ্ডন)-এ ১৯৭২ সালের ৫ই অক্টোবর এক সম্মেলনে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েন উইলকক্সের "আমেরিকান পলিসি টুওআর্ডস সাউথ এশিয়া" শীর্ষক বক্তৃতাটি দ্রষ্টব্য।

৩২। ভারতের পক্ষে ঋণ ব্যয় করার বিষয়টির নতুন বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার উন্নয়নের জন্য যে প্রকৃত ঋণ সে পাবে তা দাতার এই ধরনের সাহায্য ছাড়া ক্ষয় পেয়ে যাবে।

৩৩। জানা গেছে, হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর আলোচনা-শেষে শ্রীময়নিহান ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেটি প্রধান বিতর্কিত বিষয়—পি. এল. ৪৮০ খাতে জমা টাকার বিষয়টির সমাধানের একটি পথ খুঁজে পাওয়া সম্পর্কে আশান্বিত হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সে দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। তাঁরা শুধুমাত্র পি. এল. ৪৮০-এর সমস্যা নিয়েই নয়, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমগ্র বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন। [ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ৩রা জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ১ম কলম।]

৩৪। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৯শে মে ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭ম কলম।

৩৫। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৮ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৬-৭ম কলম। পররাষ্ট্রদপ্তরের মুখপাত্র পল হেয়ারের সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া ১৯৭৩-এর ১৬ই জুলাইয়ের বিবৃতি দ্রষ্টব্য। [দি স্টেট্‌সম্যান (নয়াদিল্লী), ১৭ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৮ম কলম।]

৩৬। ঐ, ৬ষ্ঠ কলম।

৩৭। ঐ, ৪র্থ কলম।

৩৮। অবশ্য, আমেরিকায় এই ঋণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিছু বিরোধী দেখা দিয়েছে। ওআশিংটনে ভারত-বিদ্বেষীরা এই ঋণ দানকে দেখছেন বোনাস দান হিসেবে আর তাই তাঁদের মেজাজও উঠেছে সপ্তমে। এইসব ফাণ্ডগুলি সম্পর্কে ভারতের বাধ্যবাধকতা বাতিল করতে মার্কিন সরকারের ইচ্ছুক মনোভাব সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবরগুলি দেখে এঁরা আরও উৎসাহিত হয়েছেন। কংগ্রেসের "সুস্পষ্ট অনুমোদন" ভিন্ন মার্কিন প্রশাসনের এই ধরনের চুক্তি করার অধিকার তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছেন। সম্ভবতঃ হাউস অপারেশন কমিটি—যার চেয়ারম্যান শ্রী অটো পাশম্যান একজন পুরানো ভারত-বিরোধী—তাঁদের ইতিমধ্যেই-সঙ্কুচিত সাংবিধানিক ক্ষেত্রে নিক্সন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ঠেকাবার জন্যই এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করা দরকার ব'লে মনে করেছিলেন। বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য শ্রীপাশম্যানের পরামর্শ হ'ল, এখন থেকে ২'দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ডের ৭ম শতাংশ ভারতীয় মুদ্রা নিজের কাছে রেখে দেওয়া

উচিত, যখন বর্তমানের কয়েকটি ইওরোপীয় মুদ্রার মত ভারতীয় মুদ্রাও ডলারের মত শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। স্পষ্টতই তিনি জানেন যে বারংবার সংকটের আঘাতে জর্জরিত ডলারের আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পুরানো অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তবু টাকার সঙ্গে সমকক্ষতার সম্ভাবনার কথা তুলে তিনি জনমানসে এক অমূলক আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে বর্তমান আলোচনার ক্ষতি করতে চাইছেন। [আরও বিশদ বিবরণের জন্য পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ৩০শে জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ২, ৮ম কলম দেখুন।]

৩৯। দি হিন্দুস্তান টাইমস (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুলাই ১৯৭৩।

৪০। ঐ।

পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ড সম্পর্কে সাময়িক চুক্তি।

৪১। আরও বিশদ বিবরণের জন্য দি মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭-৮ম কলম এবং দি পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২০শে নভেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭-৮ম কলম দ্রষ্টব্য।

৪২। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ৩রা জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ৭, কলম ১, টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৯শে মে ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭ম কলম, পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৮ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৬-৭ম কলম, দি স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ১৭ই জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ৮, পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ৩০শে জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ২, ৮ম কলম, দি হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ১৬ই জুলাই ১৯৭৩ এবং দি মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭-৮ম কলম।

৪৩। নব ভারত টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৩-৫ম কলম; আরও দেখুন দি স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ১লা অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ১-২য় কলম এবং দি ইনডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী), ৩রা অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ৫-৮ম কলম।

৪৩ (ক)। ইনডিয়ান এক্সপ্রেস, ৩রা অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ৮ম কলম। আরও দেখুন ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৩রা অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৮ম কলম।

৪৩ (খ)। এস. বিশ্বম, "কনসিকোয়েনসেস অব দি ইউ. এস. সেনেট ভোট", দি স্টেট সম্যান (নয়াদিল্লী), ৩রা অক্টোবর ১৯৭৩।

৪৪। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৫, ২য় কলম।

৪৫। ঐ, ৩য়-৪র্থ কলম।

৪৬। স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ২০শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ৭, ১ম কলম।

৪৭। ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ৩। আরও দেখুন—দি হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ২৪শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ৭-৮।

৪৮। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ২০শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৪র্থ কলম।

৪৯। ঐ।

৫০। ঐ, পৃঃ ১ ও ৪, কলম যথাক্রমে ৪ ও ৩।

৫১। নয়াদিল্লীতে ১৯৭৩-এর ২রা জুন অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার দেখুন। [সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ৩রা জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৭ম কলম।]

৫২। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৮ই জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ১-২।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সামরিক চুক্তি তো নয়ই, বরং এটা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি। ছয় নং ধারা, যেটি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতার প্রস্তাব করেছে,[১] তা দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশকে আরও চাঙ্গা ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে। বিশেষতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর ফলাফল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই ১৯৭২ সালের ১৫ই জুলাই তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এল. এন. মিশ্র সোভিয়েত সাংবাদিক বরিস ব্লাসভ-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে "চমৎকার, সুদৃঢ় ও সন্তোষজনক এবং উভয়ের পক্ষেই উপকারী" ব'লে বর্ণনা করেন।[২]

উভয়পক্ষের দিক থেকে পরস্পরকে সর্বাধিক সুবিধাধন্য দেশরূপে গণ্য করার ফলে ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্ত মঞ্জুর করার সাধারণ সোভিয়েত নীতি এবং ১৯৭১-এর চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারত আজ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। সুতরাং এটা আদৌ আশ্চর্যজনক নয় যে ১৯৫০-৫১ সালে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে ৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ১৯৭৩ সালের জন্য সাম্প্রতিক বাণিজ্যচুক্তির খসড়ায় ৪১০ কোটি টাকার বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা বলা হয়েছে।[৩] এর মধ্যে এক বড় অংশের লেনদেন হবে নতুন ধরনের পণ্যের। পারস্পরিক সুবিধার্থে বাণিজ্যের ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে।

জনৈক মার্কিন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ ডঃ রোনাল্ড চিফন "ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত ও পূর্ব-ইওরোপীয় দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশ হয়েছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ১৯ শতাংশ থেকে নেমে গিয়ে ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন যে, মার্কিন সরকার

ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের বিপরীতমুখিতা সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন।[৪]

অন্যদিকে, এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে, অধুনা বাণিজ্যিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রপ্তানি ১৯৭৫ সালে ৩৮০ কোটি টাকার অঙ্কে পৌঁছবে ব'লে আশা করা যায়। এর মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ভারতের উদ্বৃত্ত হবে।[৫]

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি থেকে আরও অনেক বেশী আশা করা যায়।

তুলাসংক্রান্ত চুক্তি

১৯৭১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কাপড়ের কলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য তুলা আমদানির উদ্দেশ্যে এক বিরাট চুক্তি করেন। বছরে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টন তুলা আমদানির এই চুক্তি ভারতের মিলগুলিকে বহু প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগাবে এবং সাধারণভাবে বস্ত্রশিল্পে নতুন গতি দেবে ব'লে মনে হয়।[৬] ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে যখন Gosplan-এর ডেপুটি চেয়ারম্যান নিকোলাই মিরোভভরত্সেভের নেতৃত্বে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল এদেশে আসেন এবং দু'দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা পরীক্ষা করেন. সেই সময় সোভিয়েত তুলা আমদানির বিষয়টি আলোচিত হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে পশম ও ব্রোন্ড মেটাল আমদানি করার প্রস্তাবগুলিও কম বেশী একই ধরনে আলোচিত হয়। শুধুমাত্র তুলা-চুক্তিটিই ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের আয়তনকে দশ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে।[৭]

বাণিজ্যিক রীতিনীতি

ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যিক রীতিনীতি যেটি মস্কোতে ১৯৭২-এর ৫ই মে স্বাক্ষরিত হয়েছে তার ফলে ভারতের সার, লৌহেতর ধাতু এবং নিউজপ্রিন্টের বাড়তি সরবরাহের প্রয়োজন মিটেছে। এতদিন পর্যন্ত ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লৌহেতর ধাতু কিনত, কিন্তু ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের শুরুতে তারা সাহায্যের কর্মসূচী বাতিল করলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং অন্য সূত্র খোঁজা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর ছিল না। সেই সঙ্কটের মুহূর্তে ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন। "প্রয়োজনের সময়ে যে বন্ধু হয় সেই প্রকৃত বন্ধু।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দস্তা, তামা এবং সীসার মত লৌহেতর ধাতু-গুলির বাড়তি আমদানি ভারতের শিল্পায়নকে চাঙ্গা ক'রে তোলার জন্ম বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছে।

তাছাড়া, নতুন চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ২০০,০০০ টন সার সরবরাহ জরুরী প্রয়োজন মেটাবে এবং ভারতীয় মুদ্রায় তার দাম মেটানো যাবে। অন্যদিকে চিরাচরিত সূত্রগুলি থেকে সরবরাহ পাওয়া ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে।

চুক্তির রীতিনীতির মধ্যে এ বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যে, ভারতে ট্রাক্টর তৈরির সামর্থ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার ভূমিকা স্বরূপ ৫ কোটি টাকার সোভিয়েত ট্রাক্টর ভারতে বিক্রি করা হবে।

উভয়পক্ষই ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে ৫০০ কোটি টাকায় তোলবার উদ্দেশ্যে দুই বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী এবং কর্মচারীদের নিয়ে কয়েকটি কমিটি গড়ে তুলতে রাজী হয়েছেন।[৮]

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এল. এন. মিশ্র (যিনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন) মস্কোয় সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, সোভিয়েতের মনোভাব অত্যন্ত সহযোগিতামূলক এবং এদেশের সামনে যেসব সমস্যাবলী রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাঁরা গভীর আগ্রহ দেখান।[৯]

চুক্তির আরেকটি বিষয় হ'ল কেরোসিন সংক্রান্ত ভারতীয় চাহিদা পূরণ করা, যার মধ্যে প্রতিবছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ৫ লক্ষ টন সরবরাহ করবে। যেসব জিনিসপত্র চিরাচরিত সোভিয়েত রপ্তানি ব'লে মনে করা হয় সেগুলি হ'ল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, খনি তৈল সন্ধানের সরঞ্জাম, খননকারক যন্ত্র, লিফ্‌ট ট্রাক, ক্রেন, পরিবহণ যন্ত্র, বিমান পরিবহণের সরঞ্জাম ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি। পরিবর্তে সোভিয়েতে ভারত তৈরী জামাকাপড়, গেঞ্জী, মোজা এবং কসমেটিকের রপ্তানি বাড়াবে। শুধুমাত্র কসমেটিকের মূল্যই হবে ৮ কোটি টাকার বেশী। ভারতের শিল্পদ্রব্যের মধ্যে থাকবে গ্যারাজ সরঞ্জাম, বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখার যন্ত্র (অ্যাকুমুলেটর), বিদ্যুৎশক্তির কেবল্‌স্‌, তাদের দড়ি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং রং।[১০]

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমিশ্র বলেন, এটি এক ঐতিহাসিক চুক্তি। এতে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াবার যে শর্তাদি রয়েছে শুধু তার জন্যই নয়, এর পিছনে রয়েছে শুভেচ্ছা এবং ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোভিয়েতের সাহায্য করার ইচ্ছার প্রতিফলন।[১১]

কফি রপ্তানি সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত

১৯৭২-এর জুলাই মাসের মধ্যভাগে নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে ভারত ১৯৭২-৭৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪,০০০ টন কফি রপ্তানি করে। ঐভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে তার ক্রমবর্ধমান কফি-উদ্বৃত্ত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই কফি-উদ্বৃত্ত বাগিচা শিল্পে সৃষ্টি করেছিল এক গভীর সঙ্কট।[১২]

দৃঢ়তর মৈত্রীবন্ধনের জন্য ভারত-সোভিয়েত কমিশন

অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে ভারত-সোভিয়েতযুক্ত কমিশন স্থাপন করার প্রস্তাবটি ১৯৭২ সালের ১৭ই অগস্ট বিশদভাবে উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হয় এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিশনে ভারতের পক্ষে রয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে মস্কোয় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন-এর সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত কমিশন স্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।

একই উদ্দেশ্যে মস্কোয় ১৯৭২-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৩]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় ব্যাটারি কিনল

১৯৭২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, ভারতের স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ১৮ লক্ষ টাকার "ড্রাই ব্যাটারি" সোভিয়েত ইউনিয়নে সরবরাহ করার এক চুক্তি করে।[১৪] সাধারণতঃ যে ধরনের জিনিসপত্র সেখানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে এটি সেই ধরনের নয় তাই এই চুক্তিটিকে এক বিরাট অগ্রগতি ব'লে মনে করা হয় এবং ১৯৭২-৭৩ সালে এই চুক্তির মাধ্যমে আটগুণ বেশী অর্ডার পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে। ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যে এই ধরনের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে লিনোলিয়াম। বিগত ১৯৭১ সালের অগস্ট মাসের শেষদিকে ৪৫ লক্ষ টাকার লিনোলিয়াম রপ্তানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।[১৫]

"এশিয়া ৭২"-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছরের চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রতিফলন

১৯৭২-এ ভারতের স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকী এবং সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল তাই এটি

দু'দেশের পক্ষেই স্মরণীয় বছর। ৩রা নভেম্বর বিশাল এশীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা—"এশিয়া ৭২"-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। এই মেলায় দুটি দেশই তাদের সাফল্যের পূর্ণচিত্র উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্যাভেলিয়নটি ছিল সবচেয়ে বড়। এখানে মনোমুগ্ধকর ও বৈচিত্র্যময় প্রদর্শনীতে সেদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি সবচেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করে। বিগত অর্ধশতাব্দীতে প্রথম উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশটি কি পরিমাণ অগ্রগতি করেছে তা তাঁরা দেখতে আসেন।

প্যাভেলিয়নে বাণিজ্যিক লেনদেন

প্যাভেলিয়নে বাণিজ্যিক লেনদেন ঘটেছিল বেশ তাড়াতাড়ি এবং ভাল পরিমাণেই। মেলার প্রথম দিনেই সোভিয়েতের সাথে ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির পাঁচটি চুক্তি হয়। সোভিয়েত সংস্থা "v/o zapchastexport" উইংগ্‌স্, লিবার্টি, মিলটন এবং একসেল প্রভৃতি সংস্থার তৈরী শার্ট আমদানির দায়িত্ব নেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পলিগ্রাফিক যন্ত্র, খনক (excavators) ও খনির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আমদানি করার চুক্তিও হয়। ১৯৭২ সালের ১৩ই নভেম্বর এক চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সংস্থা "v/o techmastexport" ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে ভল্টা-ধরনের একটি রোটারি যন্ত্র সরবরাহ করবে। সোভিয়েত প্যাভেলিয়নের ডিরেক্টর জানান যে ১৯৭২ সালের ২২শে নভেম্বরের মধ্যে ১৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়। তিনি বলেন, "ভারতীয় শিল্পপতিরা আমাদের যন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আগ্রহী। আমি আশা করি আগামী দিনে আরও অনেক বাণিজ্যিক লেনদেন হবে।"[১৬]

৪১০ কোটি টাকার ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য

১৯৭৩ সালে দু'দেশের মধ্যে ৪১০ কোটি টাকার বাণিজ্য হবে এই মর্মে আর একটি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ১৯৭২ সালের ২৫শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তি থেকে দেখা যায় ১৯৭২ সালে অনুমিত বাণিজ্যের মাত্রা থেকে ১৫ শতাংশ বাণিজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। যদি এই ধরনের প্রবণতা স্থায়ী হয়, তাহলে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদারের স্থান সে গ্রহণ করবে।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সোভিয়েতের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী আই. টি. গ্রিসিন এবং ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী সচিব ওয়াই. টি. শাহ।

সাধারণতঃ যে ধরনের জিনিসপত্র সচরাচর রপ্তানী হয় না যেমন, তৈরী পোশাক, বৈদ্যুতিক কেবল্‌স্‌, স্টোরেজ ব্যাটারি এবং তারের ছড়ি ইত্যাদির রপ্তানি ভারত বাড়াবে ব'লে আশা করা যায়।

সাধারণ রপ্তানি যথা—খোল, খোসাসুদ্ধ কাজুবাদাম, চা, কফি, মসলা, তামাক, তুলা ও পাটজাত শিল্পদ্রব্য রপ্তানির প্রসঙ্গও এই চুক্তিতে আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারত প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, তামা, নিকেল প্রভৃতি কাঁচামাল, সার, নিউজপ্রিন্ট এবং শোধনযন্ত্র আমদানি করবে।[১৭]

ঐ চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীশাহ বলেন যে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে তা দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার যথার্থই যোগ্য হবে। তিনি আরও বলেন, "আমরা আনন্দিত যে এখন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও ভারত বড় অংশীদার হয়ে উঠেছে।"[১৮]

নতুন অগ্রগতির প্রশংসা ক'রে তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী. এল. এন. মিশ্র ১৯৭২ সালের ১লা থেকে ২রা ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে জাতীয় আলোচনার উদ্‌বোধন ক'রে বলেন, "আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে অংশটি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে তা চলছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে।"[১৯]

এন. সি. সি. এফ. সোভিয়েত সমবায়গুলিতে পণ্য রপ্তানি করবে

ভারত ও সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সমবায় ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য এক যুক্ত-ইস্তাহার স্বাক্ষরিত হয় নয়াদিল্লীতে ১৯৭২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅমরসিং হরিকা ঐ ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। যুক্ত-ইস্তাহারে রপ্তানি বাণিজ্য ছাড়া প্রযুক্তিগত জ্ঞান, নির্বাচিত ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য, দু'দেশের ক্রেতা সমবায়গুলির কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার কর্মসূচী এবং কর্মী-বিনিময়ের কথাও রয়েছে।[২০]

অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েত আলোচনা

১৯৭২ সালের অগস্ট মাসে যে ভারত-সোভিয়েত যুক্ত-কমিশন স্থাপিত হয়, নয়াদিল্লীতে ১৯৭৩ সালের ৯ই ফেব্রুআরি তাঁরা তার প্রথম বৈঠক শুরু করেন। বৈঠকের শুরুতে দু'পক্ষের নেতারাই পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে

অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন. ভারত বাণিজ্য বিকাশের ওপর জোর দিলেও, সোভিয়েত দলের নেতা এম. এ. স্ক্যাচকভ প্রধান প্রধান শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করার বিষয়ে সোভিয়েত সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেন।[২১]

ভারতীয় দলের নেতা, পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর, তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিরাট সুযোগের কথা উল্লেখ করেন; এটিকে তিনি "এক নতুন ও উৎসাহব্যঞ্জক ক্ষেত্র" ব'লে বর্ণনা করেন। শ্রীধর বলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আমরা প্রস্তুত।" তিনি আরও বলেন যে, দু'পক্ষের মধ্যে সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনাগুলি সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।[২২]

সোভিয়েত দলনেতা এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বিগত বারো বছরে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য ছ'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৩] তিনি এই জন্যও গর্বিত যে ৯০টি সোভিয়েত সাহায্য-প্রকল্পের মধ্যে ৫০টিতেই সহযোগিতা চলছে।[২৪]

১৯৭৩ সালের জন্য বাণিজ্যচুক্তি

১৯৭৩ সালের ১৭ই ফেব্রুআরি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বলেন যে ঐ চুক্তি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির এক প্রসারিত রূপ জানা গেছে, ঐ চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বিশেষজ্ঞরা যুক্তভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন—যেসব প্রকল্পে সোভিয়েতের বিপুল পরিমাণ সাহায্য দেওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলির অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই ঐ তালিকাটি তৈরি করা হবে।

জানা গেছে, মৌলিক শিল্পগুলির সাথে সোভিয়েত সাহায্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান পেট্রোলিয়াম, তৈল সমৃদ্ধি, জাহাজ পরিকল্পনা, সার, কমপিউটার, চামড়া, কলকাতার পাতাল রেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, মহাকাশ পরিকল্পনা এবং ইলেক-ট্রনিকসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।[২৫]

আই. ডি. পি. এল.-এর সম্প্রসারণের জন্য সোভিয়েত সাহায্য

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্‌স অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স লিমিটেডের আরও সম্প্রসারণ ঘটাবার জন্য। মস্কোয় ১৯৭৩-এর ৩১শে জুন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। আই.

ডি. পি. এল.-এর চেয়ারম্যান শ্রীজগজিৎ সিং ভারতের পক্ষে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ঔষধশিল্পের সহকারী মন্ত্রী শ্রীডভোরিয়াকভস্কি চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় শ্রীজগজিৎ সিং বলেন, "ঋষিকেশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, আমাদের পরিকল্পনা হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রয়োজনীয় সাহায্য আমাদের দিতে রাজী হয়েছে তাই নিয়ে স্টেপটোমাইসিন ও টেরাসাইক্লিনের উৎপাদন সম্প্রসারণ করা।"[২৬] হায়দ্রাবাদ প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, টেকনোএক্সপোর্টকে সরঞ্জামের অর্ডার আমরা ইতিমধ্যেই দিয়েছি এবং সরবরাহের সময় সম্পর্কে মস্কোয় আলোচনাও হয়েছে।[২৭]

শোধনাগার সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত

১৯৭৩ সালের ২১শে জুলাই মস্কোতে ভারতীয় তৈল ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ডি. কে. বড়ুয়া সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উত্তর প্রদেশের মথুরায় একটি "আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর শোধনাগার" স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের জন্যই এই চুক্তি। ভারতীয় মন্ত্রী নামমাত্র ৬০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন শোধনাগারটির স্থাপনাকে "জরুরী" বলে বর্ণনা ক'রে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য মস্কো যান। নয়াদিল্লীতে ফিরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, শোধনাগারটি স্থাপন করা জরুরী যেহেতু উত্তরের বিরাট অঞ্চলসমূহকে দূর-দূরান্তর থেকে পেট্রলজাত দ্রব্য আনতে হয়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের উপকারার্থে সার-কারখানা স্থাপনের জন্যও এই প্রকল্প স্থাপন করা জরুরী বিষয়।[২৮]

সোভিয়েত সাহায্যের গুরুত্ব বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে, ভাতিন্দা, কর্ণাল অথবা পাণিপথ এবং মথুরায় সার-কারখানা খোলা নির্ভর করবে মথুরা শোধনাগারের ক্ষমতা প্রাপ্তির উপর যেহেতু এই শোধনাগার থেকেই এইসব সার প্রকল্পের জ্বালানী তেল পাওয়ার আশা রয়েছে।

এই শোধনাগারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় মুদ্রার অঙ্কে ঋণ দেবে এবং যেসব সরঞ্জাম ভারতে প্রস্তুত করা যায় সেগুলি ছাড়া ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের আর সবরকম সরঞ্জামই তারা সরবরাহ করবে। এই তথ্য সোভিয়েত ঋণ ব্যবস্থার উদারতাই প্রমাণ করে। তাছাড়া ভারতেই যাতে কয়েকটি সরঞ্জাম গ'ড়ে তোলা যায় তার জন্য ২২,০০০ টন ইস্পাত সরবরাহের যে চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছে তা সোভিয়েত সাহায্যের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলেছে।

শ্রীবড়ুয়া যিনি মথুরা শোধনাগার সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েত চুক্তিতে

স্বাক্ষর করেছেন, জনৈক সোভিয়েত সংবাদদাতার কাছে বলেন যে ইস্পাতের মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যের ভিত্তিতেই স্থির করা হবে কিন্তু দাম শোধ করা হবে টাকার অঙ্কে। তিনি বলেন, স্বল্প বিনিয়োগ ক'রে শোধনাগারের ক্ষমতা সাত মিলিয়ন টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, সোভিয়েত সরঞ্জামের অধিকাংশই ১৯৭৭ সালের আগেই সরবরাহ করা হবে ব'লে আশা করা যায় এবং সেই সময়েই শোধনাগারটিও চালু হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।[২৯]

শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক সোভিয়েত সাহায্যের প্রশংসা

১৯৭৩ সালের ২রা অক্টোবর মথুরায় ভারতের সবচেয়ে বড় তৈল-শোধনাগারের ভিত্তি স্থাপন ক'রে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে ভারতের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য হ ল "বন্ধুত্বের নিদর্শন"। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরাক যারা মথুরা শোধনাগারকে সম্ভব ক'রে তুলেছে, শ্রীমতী গান্ধী আবেগের সাথে তাদের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে ভারত সবদেশের সাথেই সৌহার্দ্য চায়, কিন্তু যদি কেউ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব না চায় তবে ভারত নাচার, তবে তারা সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হলেও ভারত এগিয়ে যাবে।

ভারতের তৈল ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ডি. কে. বড়ুয়া তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে বলেন, তৈল-শোধনাগারটি যে শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশেরই প্রভূত উপকারে লাগবে তাই নয়, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবেরও উপকারে লাগবে এবং তা লাগবে বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্রে। তিনি বলেন, তৈলজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য-বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তৈলক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, মথুরা শোধনাগার এই পথে এক বিরাট পদক্ষেপ, এটি বছরে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ টন তেল শোধন করবে।

তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে শোধনাগারটির পরিকল্পনা এবং কিছু সরঞ্জাম ও মাল সরবরাহে সাহায্য করে। তিনি আশা করেন যে এর ফলে প্রাচীন মথুরা শহরের জনগণের বিপুল জাগতিক উন্নতি ঘটবে।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীআকবর আলি খান ভারতকে এক শক্তিশালী শিল্পরাষ্ট্ররূপে গ'ড়ে তোলার জন্য জওহরলাল নেহেরুর স্বপ্নের কথা স্মরণ ক'রে বলেন যে মথুরা শোধনাগার প্রাচীন মথুরায় এক "আধুনিক মন্দির"। তিনি মনে করেন যে মথুরা শোধনাগারের ভিত্তিস্থাপন গান্ধী জয়ন্তী স্মরণে গঠন-মূলক কাজ করার এক যথার্থ ভাববাহিকা।

মথুরা শোধনাগার ১৭৩-এর ২০শে জুলাই-এর আন্তঃসরকারী চুক্তি অনুসারে সোভিয়েতের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাবে। চুক্তির শর্তানুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন শোধনাগারটির প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরি করবে, কিছু সরঞ্জাম ও মাল সরবরাহ করবে এবং শোধনাগারটি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শোধনাগারটির পরিকল্পনা আংশিকভাবে করবেন সোভিয়েত পরিকল্পনা সংস্থা যাঁরা ইতিপূর্বে বারৌণি ও কয়াতি শোধনাগারের পরিকল্পনা করেছিলেন। তৈল-শোধনাগারের সঙ্গে যখন সার-কারখানা এবং পেট্রো-কেমিক্যাল সমাহার যুক্ত হবে তখন মথুরা হয়ে দাঁড়াবে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। তৈল-শোধনাগারকে কেন্দ্র ক'রে ঐ এলাকায় অনেক সহায়ক শিল্প গ'ড়ে উঠবে ব'লে আশা করা যায়। তার মধ্যে কৃত্রিম রবার, টেরিন এবং প্লাস্টিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মস্কোয় শোধনাগার বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াও ভারতীয় মন্ত্রী শ্রীবড়ুয়া সেখানকার বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ভূপদার্থবিদের সঙ্গে ভারতে ব্যাপকভাবে ভূতাত্ত্বিক এবং ভূপদার্থ বিষয়ক সমীক্ষা চালাবার প্রশ্ন আলোচনা করেন। শ্রীবড়ুয়া বলেন যে রাশিয়া এইসব সমীক্ষায় বরাবরই সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এখন আরও গভীরভাবে এই সমীক্ষা চালিয়ে তৈলের খনিগুলো খুঁজে বার করতে হবে। কারণ যে তৈলকূপগুলো শুকিয়ে আসছে, তাদের জায়গায় নতুন নতুন কূপ খনন করা দরকার।[৩০]

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির অগ্রগতি: ফোটো প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

১৯৭৩ সালের ১৯শে জুলাই কৃষিবিষয়ক রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী এ. পি. সিন্ধে দিল্লীর হাউস অব্ সোভিয়েত কালচারে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিবিষয়ক একটি ফোটো প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "এই প্রদর্শনী ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার এক বিরাট চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।"

সোভিয়েত যৌথ খামারের কর্মীরা যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তার চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অগ্রগতি কিভাবে গ্রামের চেহারা বদলে দিয়েছে, প্রদর্শনীতে তা দেখবার সুযোগ প্রত্যেক দর্শকই পেয়েছেন।

সিন্ধে বলেন যে, ভারতে যখন কৃষির বিকাশের দিকে সকলের নজর পড়েছে এবং ফসল উৎপাদনে প্রকৃতির বিরূপতা নিবারণের উপায় নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন সোভিয়েত প্রদর্শনী খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। প্রদর্শনী দেখে সোভিয়েত কৃষির বহুমুখিতা এবং প্রাকৃতিক বিরূপতা নিবারণে তাদের বিরাট অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতবাসী অবহিত হয়েছে। তিনি বলেন,

"যে সমস্ত এলাকা বছরের মধ্যে ছ'মাস বরফের তলায় থাকে, এবং যেখানে তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টির ফলে দারুণ ক্ষতি হতে পারে, সেখানেও যে উপায়ে চমৎকার শস্য তোলা হয়েছে, আমরা তার ভূয়সী প্রশংসা করছি। আবহাওয়া পরিবর্তন ও তুষার দূরীকরণের ক্ষেত্রে রুশীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশংসা করছি এবং এথেকে আমরাও বিশেষভাবে লাভবান হতে পারি।"

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা গত কয়েক বছরে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্পর্কে শ্রীসিন্ধে বলেন: "সোভিয়েত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় খামার এখন আমাদের রয়েছে। রুশীয় 'মেরিনোর' ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা এখন মেষ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।" তিনি বলেন, বিখ্যাত কারা-কুল মেষ ব্যবহার ক'রে ভারতের রাজস্থান ও গুজরাটের মরু অঞ্চলে মেষ উন্নয়ন কর্মসূচী জোরদার করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞ।[৩১]

সমাবেশে ভাষণ দিয়ে ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের কাউনসিলর শ্রী এল. ভি. এমেলিয়ানভ বলেন, প্রাক্ বিপ্লব যুগে এক আদিম অবস্থায় ও সর্বদাই শস্য নষ্ট হওয়ার ভীতির মধ্যে বাস করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন একটি শিল্পে-উন্নত ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশ।

সর্বশেষে শ্রীএমেলিয়ানভ আশা প্রকাশ করেন যে, কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা ও দুই দেশের জনগণের মৈত্রী আরও অনেক শক্তিশালী হবে।[৩২]

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিশলক্ষ টন খাদ্যশস্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে ঋণ হিসাবে বিশলক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রস্তাব করেছে। এই খাদ্যশস্যের মধ্যে থাকবে কিছু পরিমাণ চাল এবং অধিকাংশই গম। সোভিয়েতের এই সাহায্য ভারতের সঙ্গে তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আরেকটি নিদর্শন।

১৯৭৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীলিওনিদ ব্রেজনেভ ব্যক্তিগতভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক বিশেষ বার্তা পাঠিয়ে ঐ প্রস্তাবের কথা জানান।

শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই পত্রে শ্রীব্রেজনেভ বলেন: "প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে উদ্ভূত ভারতের বর্তমান খাদ্যসংকটের কথা চিন্তা ক'রে এবং ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আরও উন্নতি ঘটানোর বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সোভিয়েত সরকার ঋণ হিসাবে ভারতকে কিছু পরিমাণ চাল সমেত বিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের ইচ্ছা প্রকাশ করছে।" শ্রীমতী গান্ধীকে শ্রীব্রেজনেভ আরও জানান, "এই সরবরাহ অবিলম্বেই শুরু করা যেতে পারে... ।"[৩৩]

ভারত এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে এবং সোভিয়েত সরকারের বন্ধুত্বের এই পরিচয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত নেতার কাছে তাঁর জবাব পাঠিয়ে দেন।

১৯৭৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের খাদ্য-সচিব শ্রী জি. সি. এল. জোনেজা সোভিয়েত-প্রস্তাব গ্রহণের খবর ঘোষণা ক'রে বলেন: "এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল আমাদের বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ নিজে থেকে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে।"[৩৪]

সোভিয়েত সাহায্যের এই আশ্বাস এবং খরিফ শস্য উৎপাদন ভাল হওয়ার ফলে ভারত তার চরম খাদ্যসংকট পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

সোভিয়েত গম-ঋণ প্রস্তাব অভিনন্দিত

সংকটের সময়ে এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ঋণ দেবার প্রস্তাব ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধুত্বের যে নিদর্শন রেখেছে কলকাতার কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয় মহল থেকেই তাতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সোভিয়েত বন্ধুত্ব মার্কিন ব্ল্যাকমেইলকে পরাস্ত করার কাজে ভারতকে সাহায্য করবে। পশ্চিম বাঙলার খাদ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি. কে. ঘোষ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বলেন, সোভিয়েত প্রস্তাবের এই খবর এখানকার বাজারে দ্রুত প্রভাব সৃষ্টি করেছে। চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে কিলোপ্রতি পঞ্চাশ পয়সা। তিনি আরও বলেন, সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে একথা বুঝতে পারলেই মজুতদাররা নরম হতে বাধ্য হবে।[৩৫] অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ দে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বন্ধুত্বে দেশের সমস্ত মানুষের কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত।[৩৬] কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি হিসাবে সি পি আই-র পশ্চিম বাঙলার সম্পাদক শ্রীগোপাল ব্যানার্জী বলেন, এক সংকটজনক সময়ে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য এসেছে। স্বাভাবিক

ভাবেই এই সাহায্য বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠতে দেশকে শক্তি যোগাবে। সি পি আই নেতা আরও বলেন, এই ঋণের পেছনে শর্ত আরোপ করা হয় নি এবং এই মাল পরিবহণের জন্য বিরাট মাশুলের বোঝা দেশকে বহন করতে হবে না।[৩৭] এই মনোভাব প্রকাশ ক'রেই সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত বলেন, মার্কিনী ব্ল্যাকমেইল পরাস্ত করতে এই সোভিয়েত ঋণ ভারতের সাহায্যে লাগা উচিত। তিনি বলেন, বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এবং এই জাতীয় কার্যের দ্বারা ভারত সোভিয়েত মৈত্রীকে আরও অনেক শক্তিশালী করা সম্ভব।[৩৮]

ভারতের উত্তরাঞ্চলেও একই রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় সরকারী ও বাণিজ্যিক মহলের সূত্রে প্রকাশ, সোভিয়েত ঋণ-প্রস্তাব এবং ভারত কর্তৃক তা গ্রহণের ফলে শস্যের বাজারে ভাল প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশে ঐ গম এসে পৌঁছলে অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটতে পারে।[৩৯]

১৯৭৩-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকর দয়াল শর্মা বলেন, বিশলক্ষ টন সোভিয়েত গম ঋণের দরুন ভারতকে কোন মূল্য না-ও দিতে হতে পারে। নয়াদিল্লীর কাছে ফতেপুর বেরিতে 'সমাজবাদী লোক মঞ্চ' আয়োজিত এক সভায় ভাষণদান কালে ডঃ শর্মা এই গম-ঋণকে সোভিয়েত মৈত্রীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে অভিনন্দিত করেন।[৪০]

১২ই অক্টোবর মস্কোতে এই সোভিয়েত ঋণ সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সচিব শ্রী পি. এন. ধর এবং সোভিয়েত বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের প্রথম প্রতিমন্ত্রী শ্রী এম. আর. কুজমেন। চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে সোভিয়েত ঋণ পরিশোধ করতে হবে সাত বছর ধরে।

দিল্লীর কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতের জনজীবনের এক সংকটপূর্ণ সময়ে এই সোভিয়েত সাহায্য আবার প্রমাণ করছে যে মস্কো ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়। নিজের যথেষ্ট অসুবিধার সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভারতের জন্য খাদ্যশস্য পাঠাতে প্রস্তুত, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি তারা যে কতটা গুরুত্ব আরোপ করে এটাই তার বড় প্রমাণ।

অন্যদিকে, মথুরা শোধনাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত

ইউনিয়নের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং নাম না ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সমালোচনা করেন। শেষোক্ত রাষ্ট্রটির উদ্দেশ্যে তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে বলেন: আমাদের সঙ্গে যদি বোঝাপড়া ক'রে চলতে পারেন তবেই আপনারা আমাদের মিত্র। অন্যথায় আমাদের নিজেদের চালিয়ে নেবার পক্ষে আমরা যথেষ্ট সক্ষম।[৪১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যালুমিনা প্রকল্পের কার্যকারিতার সমীক্ষা তৈরি করবেন

নিম্নমানের আকরিক সহ মধ্যপ্রদেশে মজুত বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনা উৎপাদনের জন্য একটি প্রকল্প স্থাপনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্য-কারিতা রিপোর্ট তৈরি ক'রে দিতে সম্মত হয়েছে। এই বিষয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটিকে সম্ভবতঃ সরকারী ক্ষেত্রাধীন সংস্থা ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী লিমিটেড (BALCO)-র আওতায় রাখা হবে। এখানে উল্লেখের বিষয়, কোরবা এবং রত্নগিরিতে ২টি অ্যালুমিনিয়াম প্রকল্প স্থাপনের দায়িত্ব BALCO-র ওপর অর্পণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১১ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ইস্পাত ও খনি মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির এক বৈঠকে শ্রী টি. এ. পাই (ইস্পাতমন্ত্রী) জানান, মধ্যপ্রদেশের মালাজকুঁদে মজুত তাম্র আকরিকের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকল্পের সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি ক'রে দেওয়ার জন্য একটি সোভিয়েত সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ঐ অঞ্চলে মজুত তাম্রের পরিমাণ যথেষ্ট। এক বছরের মধ্যে সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ হবে।[৪২]

১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৫,০০০ টন জিঙ্ক ও ১,৮০০ টন তামা আমদানির ব্যাপারে ২০ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৭৮-এর ৯ই নভেম্বর দিল্লীতে ঐ চুক্তি স্বাক্ষর করেন এম এম টি সি-র জেনারেল ম্যানেজার শ্রীভাটনগর এবং সোভিয়েত রপ্তানি সংস্থা 'রাজনো-ইমপোর্ট'-এর প্রতিনিধি শ্রীসেমেনভ।

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শ্রীভাটনগর বলেন, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিয়মিতভাবে তামা ও দস্তা আমদানি করলেও, এই চুক্তি খুবই সময়োপযোগী এবং দ্রুত সরবরাহের সহায়ক। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, তামা ও দস্তার বিশ্ববাজারের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই চুক্তি উল্লেখযোগ্য। শ্রীভাটনগর বলেন, এম এম টি সি বৈদেশিক মুদ্রার

সাহায্যে জাম্বারিয়া ও পেরু থেকে তামা কিনে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে এম এম টি সি দস্তা ও তামা ছাড়াও সহজ শর্তে প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম ও সার আমদানি করছে। শ্রীভাটনগর আরও বলেন, এম এম টি সি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপুল পরিমাণে অভ্র সরবরাহের প্রস্তাব করবে। বদলে ক্রয় করা হবে সার, অ্যাজ্‌বেসটস ও প্রতিরোধক দ্রব্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে 'পারস্পরিক সুবিধাদায়ক' ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের বাণিজ্যিক লেনদেন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভারত শ্রমমুখীন 'উৎপাদন সহযোগিতা' শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ১৯৭২-এ ইলেকট্রনিক দপ্তর থেকে পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলিতে যে দুটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল, ঐ পরিকল্পনা তারই ফল।[৪৩]

এই দপ্তরের ১৯৭২ ৭৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ইলেকট্রনিক শিল্প বর্তমানে আমদানির জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে অন্তত পাঁচ কোটি টাকার পণ্য ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেনের ভিত্তিতে আমদানি করা যায়। এছাড়া, কমপোনেণ্ট ও এনটারটেইনমেণ্ট শিল্পেও তিন কোটি টাকা পরিমাণ ঐ বাণিজ্যের আওতায় আনা যেতে পারে।

কমেকন ভারতকে গ্রহণে রাজী

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক সংস্থা 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ' (কমেকন) তার পূর্ণ সদস্য বা পর্যবেক্ষকরূপে ভারতকে গ্রহণ করতে রাজী আছে। ১৯৭২-এর ১০ই অক্টোবর মস্কোয় কমিউনিস্ট সূত্র থেকে এই খবর জানানো হয়। তাঁরা বলেন, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারত যেভাবে নিজেকে যুক্ত করতে চাইবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতেই সমর্থন জানাবে। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতের যোজনামন্ত্রী ডি. পি. ধরের আলোচনার সময়ে এই ব্যাপারে ভারতের আগ্রহের আভাস পাওয়া যায়।[৪৪] এখানে উল্লেখের বিষয়, গত ১০ বছরে পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৮·৬ হারে, সেখানে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে ঐ বাণিজ্য বৃদ্ধির হার শতকরা ১·১।[৪৫]

সহযোগিতার চুক্তি

১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি সহযোগিতার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তি

অনুযায়ী কৃষি উন্নয়ন সমীক্ষার কাজে দুই দেশের মধ্যে খামার-বিশেষজ্ঞ বিনিময় হবে। চুক্তিতে সই করেন সোভিয়েত কৃষি-প্রতিমন্ত্রী আর. এন. সেদাক এবং ভারতের কৃষি-মন্ত্রকের সচিব টি. পি. সিং।[৪৬] শ্রীসেদাক বলেন, নতুন ধরনের ধান ও গম বীজ বাছাইয়ের কাজে গত বছর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যা করেছেন, তাতে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ। মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে এক সোভিয়েত সাংবাদিককে তিনি বলেন, ভারতীয়রা নতুন এমন এক ধরনের গম উৎপন্ন করেছে, ঠিকমত সেচ পেলে ভারতের আবহাওয়াতেই তার ফলন হবে হেক্টর-প্রতি সাত থেকে আট টন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে ভারতে শস্য উৎপাদনেরও তিনি প্রশংসা করেন।[৪৭]

কলকাতার পাতাল রেলে সোভিয়েত সহযোগিতা

১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাতাল রেলপথের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৯ সালে ১৪০ কোটি টাকার এই বিরাট প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে কলকাতা হবে ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার ভূগর্ভস্থ দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরের অন্যতম।

ইতিমধ্যেই দমদমে এই ভূগর্ভ রেলপথের কাজ শুরু হয়েছে। এখান থেকে শুরু হয়ে এই রেলপথ যাবে (সাড়ে ষোলো কিলোমিটার দূর) টালিগঞ্জ পর্যন্ত। কাজের এখন সবে শুরু, এখনও অনেক গতি পেতে হবে।

এই প্রকল্পটি ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার একটি চমৎকার উদাহরণ। ১৯৭২-৭৩ সালেই প্রকল্পটির জন্য তিন কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাবিত হয়। গোটা প্রকল্পটিতে মোট ২৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হবে।[৪৮]

সোভিয়েত সাহায্য প্রশংসিত

প্রকল্পটির প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরির কাজের বিভিন্ন স্তরে সোভিয়েত সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস. এম. মুখার্জী এবং চীফ এঞ্জিনিয়ার শ্রী জে. এন. রায়। শ্রীমুখার্জী বলেন, ভারতে এই কাজ এক নতুন কারিগরী অভিযান ব'লে ভারত সরকার দুটি সোভিয়েত পরামর্শদাতা দলকে ভারতে আমন্ত্রণ জানান—১৯৭০ সালের শেষে আসেন কাভেরিন দল এবং '৭১-এর শেষে রুমিন দল।[৪৯]

এই প্রকল্পের ব্যাপারে সোভিয়েত পরামর্শদাতাদের প্রথম যে দলটি কলকাতায় আসেন, তাঁরাই দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ দ্রুত পরিবহণ

ব্যবস্থা তৈরির সুপারিশ করেন। উপকণ্ঠ থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত লাইন টেনে নিয়ে সার্কুলার রেলপথ তৈরির যে প্রস্তাব আগে করা হয়েছিল, তাঁদের মতে তা উপকণ্ঠের যাত্রীদের প্রয়োজন সামান্যই মেটাতে পারবে এবং শহরের ভিতরকার যানবাহনের জট ছাড়ানোর সমস্যার মাত্র আংশিক সমাধান করতে সক্ষম হবে। তাঁদের বিবেচনায় সড়কপথের উপর বা নীচ দিয়ে দ্রুত যান-চলাচল ব্যবস্থাই শহরের পরিবহণ সমস্যার একমাত্র সমাধান। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে এই সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প রিপোর্টটি তৈরী হলে দ্বিতীয় সোভিয়েত পরামর্শদাতা দলটিও তার সঙ্গে একমত হ'ন।

শ্রীমুখার্জী বলেন, প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে কি কি সাহায্য লাগবে, ভূগর্ভ রেলপথ গঠনে সরকারের সম্মতি পাওয়ার পর এঞ্জিনিয়াররা বিস্তারিত ভাবে তার তালিকা প্রস্তুত ক'রে ফেলেছেন।[৫]"

সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগতি এবং সোভিয়েত সহযোগিতা

কৃষ্ণসাগর জাহাজী প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বলা হয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার জাহাজী পরিবহণ ১০ লক্ষ টন ছাড়িয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করবে। এই ঘটনা শুধু সোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের লক্ষণীয় বাণিজ্যবৃদ্ধিই নয়, দ্রুতবর্ধমান সামুদ্রিক-বাণিজ্য-নৌবহরের গুরুত্বেরও পরিচায়ক।

কৃষ্ণসাগরের সোভিয়েত বন্দরসমূহ থেকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী সমুদ্রপথ বরাবর সোভিয়েত ও ভারতীয় জাহাজগুলি '৭৩ সালের গোড়া থেকে ত্রিশবারেরও বেশী পারাপার করেছে। গত বৎসর ঐ একই সময়ে যে পরিমাণ সামগ্রী পরিবহণ হয়েছিল, এবার হয়েছে তার চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশী।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ভারত সোভিয়েত জাহাজী-পরিবহণ ব্যবস্থার উদ্‌বোধন হয় আজ থেকে ১৭ বছর আগে (১৯৫৬ সালে)। দুই দেশের অর্থনৈতিক যোগাযোগের উন্নয়নে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়ের মধ্যে জাহাজী পরিবহণের পরিমাণ আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, '৬২ সালের ৩৭,৯৪,৪৯০ লক্ষ টন থেকে '৬৯ সালে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫,৪৮,১২০ লক্ষ টনে। সোভিয়েত জাহাজগুলি (এই পথে এখন ১৫টি চলাচল করছে) এখন প্রায় কুড়িটি ভারতীয় বন্দরে খামারের যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ি, সড়ক-নির্মাণের যন্ত্র, সার ইত্যাদি সরবরাহ ক'রে যাচ্ছে। এই বছর

ভারতের জন্য ফসল কাটার যন্ত্র এবং বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়েছে।

বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়মিতভাবে সরবরাহ ক'রে ভারত-সোভিয়েত জাহাজী-পরিবহণ ব্যবস্থা ভারতের উন্নয়নে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সেকথা ছেড়ে দিলেও টাকায় ঋণ-পরিশোধ ব্যবস্থা ভারতের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটাচ্ছে। আবার গত দশ বছরে বিশ্বে মাল পরিবহণের মাশুল যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই তুলনায় ভারত-সোভিয়েত জাহাজী-পরিবহণের মাশুল মোটামুটি একই রয়েছে।

ইতিমধ্যে, ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্য নৌবহরের উন্নয়নে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান সাহায্যদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে শুধু তৈলবাহী ও মালবাহী জাহাজই সরবরাহ করেছে না, বড় বড় জাহাজ তৈরির জন্য জাহাজ-নির্মাণ কারখানাগুলির সম্প্রসারণের ও আধুনিকীকরণের জন্যও সাহায্য ক'রে চলেছে।

বর্তমানে ভারত তার নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজে বৈদেশিক বাণিজ্য সামগ্রীর মাত্র শতকরা বিশ ভাগের আনা-নেওয়া করতে পারে। মাল পরিবহণ বাবদ তাকে ১৭০-১৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা গুনতে হচ্ছে—এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার এই বিরাট খরচের ফলেই ভারত সরকার তার পঞ্চম যোজনায় এক কোটি জি আর টি-র লক্ষ্যে পৌঁছনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অধুনা ২৬ লক্ষ টন জি আর টি এবং ১৫ লক্ষ টন জি আর টি-র যে ক্ষমতা রয়েছে, এটি তার প্রতি একটি বিরাট সংযোজন।

এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তিনটি অতিরিক্ত জাহাজ-নির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আরও কিছু জাহাজ ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ব্যাপারে অধিকাংশ চুক্তিই হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জি ডি আর, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে।[৫১]

ভারত-সোভিয়েত নতুন জাহাজী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে

দুই দেশের সমস্ত বন্দর ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য জাহাজী চুক্তি সংশোধনের ব্যাপারে দুই দেশই একমত। গত ১৯৭২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মস্কোয় সফররত ভারতীয় জাহাজ, পরিবহণ ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী এবং সোভিয়েত নৌ-বাণিজ্যমন্ত্রীর মধ্যে ঐ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে স্বাক্ষরিত বর্তমান জাহাজী চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র

কৃষ্ণসাগরীয় বন্দরগুলি থেকে ভারতে জাহাজ পরিবহণ চলছে। এখন উভয়েই অনুভব করছে যে, দুই দেশের মধ্যে নতুন ও বহুমুখী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাল্টিক ও আরও পূর্বের সোভিয়েত বন্দরগুলিকে আওতায় এনে চুক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো দরকার।[৫২]

সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে তিনটি তৈলবাহী জাহাজের অর্ডার দেয়া হয়েছিল, তার প্রথমটি লেনিনগ্রাদ জাহাজ-নির্মাণ কারখানা থেকে ভারতকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ভারতের জাহাজী করপোরেশনের জন্য এটিই সোভিয়েতে প্রস্তুত দ্বিতীয় জাহাজ।

প্রথম জাহাজটি, ১৩৬০০ DWT-র এম ভি বিশ্ব উমাং সম্প্রতি খেরসন-এ সোভিয়েত জাহাজ-নির্মাণ কারখানা থেকে রওনা হয়ে পথে রুমানিয়ায় সার বোঝাই ক'রে মাদ্রাজে এসে তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা শেষ করেছে। আরও তিনটি মালবাহী জাহাজ এখন সোভিয়েত জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে এবং শীঘ্রই একে একে সেগুলি ভারতকে সরবরাহ করা হবে।

একটি ভাল চুক্তি

'বিশ্ব উমাং'-এর ক্যাপটেন এম শেঠি জাহাজটি পেয়ে খুব খুশী। তিনি বলেন, "আমাদের জন্য মালবাহী জাহাজ নির্মাণ করতে প্রস্তুত এমন জাহাজ-কারখানা বিশ্বে বেশী নেই। আর, মাত্র চার মাসের মধ্যে বিশ্ব উমাং-এর মত বিরাট জাহাজ তৈরি ক'রে দেবে এমন কারখানা খুঁজে পাওয়াই মুশ্‌কিল। সেই জন্যই আমি মনে করি, রাশিয়ায় চারটি মালবাহী ও তিনটি তৈলবাহী জাহাজের অর্ডার দিয়ে আমরা খুব ভাল কাজ করেছি।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বের মোট জাহাজী শুল্কের মাত্র একভাগ ভারতের ভাগে পড়ে এবং সে তার সামুদ্রিক বাণিজ্যসম্ভারের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ নিজে বহন করে। অবশিষ্ট অংশ বহন করে বিদেশী জাহাজ।

এই অসুবিধা দূর করার জন্যই ভারত তার মালবাহী নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় নেমেছে। ফলে, দেশের জাহাজ-নির্মাণ কারখানাগুলিতে অগ্রগতি ঘটছে দারুণভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের জাহাজ-নির্মাণ কারখানাগুলির মোট ক্ষমতা মাত্র ২,১০,০০০ জি আর টি-তে দাঁড়াবে ব'লে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজার থেকে জাহাজ ক্রয়ের চেষ্টায় নেমে ভারতকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সীমিত

এবং বড় বড় পুঁজিবাদী জাহাজ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের বাণিজ্যিক নৌবহরের উন্নয়নে সাহায্য করতে আদৌ আগ্রহী নয়। ফলে তারা বহু অসম্ভব শর্ত আরোপ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে সংঘাতিক দাবি হ'ল, ভারতকে সম্পূর্ণ অভারতীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আর্থিক গ্যারান্টি দাখিল করতে হবে।

গত ২৫ বছরে ভারতের জাহাজী পরিবহণ ক্ষমতা ২০০,০০০ জি আর টি থেকে ৪,০০০,০০০ (উপকূলবর্তী জাহাজ পরিবহণ সহ) জি আর টি-রও বেশীতে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশগুণ। এর কৃতিত্ব প্রধানতঃ ভারতের এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাহাজ-নির্মাণ কারখানাগুলির। ভারতের জাহাজী করপোরেশনের অধীন ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার DWT-র শতকরা ৪০ ভাগই এসেছে জি ডি আর, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া থেকে। এখন সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের প্রধান জাহাজ সরবরাহকারীতে পরিণত হয়েছে। **বিশ্ব উমাং**-ই ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের এই নতুন ধারার প্রথম ফল।

পারস্পরিক বোঝাপড়া

ভারতের জাহাজী করপোরেশনের আঞ্চলিক ডাইরেক্টর জে. ডি. মেহ্তা **বিশ্ব উমাং**-এ এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় বলেন: "এই জাহাজটি ভারত-সোভিয়েত নৌ-চলাচল ব্যবস্থার পরিণতি। এই নৌ-চলাচল ব্যবস্থা এখন বিরাট বিস্তৃতি লাভ করেছে। যুক্ত জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থার মাধ্যমে এর শুরু হয়েছিল এবং এখন আমরা সোভিয়েত কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ গ্রহণের জন্য আরেকটি পদক্ষেপ নিয়েছি।" তিনি বলেন, "চমৎকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আমাদের সহযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালে খুব ছোট্টভাবে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। তখন মাত্র ৮০ হাজার টন মাল পরিবহণ করা হ'ত। এখন তা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ টনেরও বেশী। সুতরাং প্রথম জাহাজী চুক্তির পর থেকে দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। এই অগ্রগতি দুই অংশীদারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতারই ফলস্বরূপ।"

তিনটি প্রধান নীতির ওপর ভারত-সোভিয়েত চুক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে: জাহাজ নিয়োগে তুল্যতা, পরে একে সমুদ্রে চলাচলে তুল্যতায় পরিণত করা হয়; জাহাজে বাহিত মালের বন্টনে তুল্যতা; এবং ভারতীয় মুদ্রায় মাশুল আদান-প্রদান।

এই চুক্তি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে অনুকরণীয়। কারণ এটিই

সত্যিকারের সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে একটি উন্নত ও একটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রথম জাহাজী চুক্তি। উঠতি দেশগুলির বাণিজ্যিক নৌশক্তির উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে পুরানো অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে জাহাজী সম্মেলনগুলিতে বড় বড় পুঁজিপতি দেশগুলি নিজেদের দাপট ও প্রতিপত্তির জোরে ইচ্ছামত শর্ত আরোপ করে। এইসব শর্তই 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে এবং ক্রমবর্ধমান মাশুলের মুখে তাদের অসহায় ক'রে তোলে।

কোন উন্নয়নশীল দেশ যাতে তার রপ্তানির শতকরা ১৫ ভাগের বেশী নিজের জাহাজে বহন না করে, সম্মেলনগুলি থেকে তার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এমনকি, সমস্ত মাল ক্রেতা-দেশগুলির জাহাজে পাঠাতে হবে, এমন শর্ত গ্রহণ করার জন্যও তারা 'তৃতীয় বিশ্বকে' বাধ্য করে।

উৎকৃষ্ট উদাহরণ

সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু সামুদ্রিক-বাণিজ্যকারী দেশগুলির সঙ্গে সত্যিকারের সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনেই উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেনি, উন্নয়নশীল দেশগুলির ন্যায্য অধিকার রক্ষায় সাহায্যের জন্য সে তার সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করেছে। জাহাজী সম্মেলনের 'আচরণ বিধি' প্রণয়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইওরোপের সমস্ত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র UNCTAD III তে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে একযোগে ভোটদান করে। এর ফলে ভারত ও 'তৃতীয় বিশ্বের' অন্যান্য রাষ্ট্র যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলি এখন ভারতের নৌশক্তির সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এবং এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ভারতে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মাছ ধরার জাহাজ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারিত করেছে।

পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে এইসব ক্ষেত্রের সহযোগিতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের জাহাজী করপোরেশনের প্রতিনিধিগণ তাই বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে "কোন মতবিরোধই নেই" এবং সমস্ত সমস্যাই "অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধান করা হয়।"

সহযোগিতার এই নতুন দিকের প্রসঙ্গে শ্রী জে. ডি. মেহ্‌তা "জাহাজ-বাহিত মালের আধারের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা"-র কথা উল্লেখ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের জন্য যে জাহাজ নির্মাণ শুরু করেছে, তিনি

বিশেষভাবে তাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, এই কাজের অগ্রগতি ঘটবে, বিশেষতঃ তৈলবাহী জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে। ভারতের জাহাজী করপোরেশনের পক্ষে এটি অত্যন্ত শুভারম্ভ।"

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞগণ মালাঞ্চখাঁদে বিরাট তাম্র ভাণ্ডারের সম্ভাবনা দেখেছেন

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞগণ হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, মালাঞ্চখাঁদ তাম্রখনি থেকে বছরে ২০ হাজার টন তাম্র উৎপাদন সম্ভব। ক্ষেত্রী কপার কমপ্লেক্সের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম. ভি. এন. আর. শেষগিরি রাও জানান, সোভিয়েত খনি-বিশেষজ্ঞগণ মালাঞ্চখাঁদ প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে যে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করেছেন, তাতে মালাঞ্চখাঁদ খনিকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম তাম্র-উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা শীঘ্রই এ বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করবেন। ঐ অঞ্চলে 'অগভীর খনির' (open cast mining) কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। ক্ষেত্রী এবং কোলিবানের থেকে মালাঞ্চখাঁদের আকরিকে তাম্রের পরিমাণ বেশী এবং এই আকরিক থেকে ক্ষেত্রীতে তাম্র উৎপাদন করা হবে।

সোভিয়েত রাশিয়া তৈল সন্ধানের কার্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিতে চেয়েছে

সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের দেশে তৈলের সন্ধানে গভীর খননকার্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ভূপ্রাকৃতিক সরঞ্জাম দেবার প্রস্তাব করেছে। ১৯৭৩-এর ৩০শে জুন এ. পি. এন.-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের পি. কে. লাহিড়ী ও পি. টি. ভেনুগোপাল ঐ খবর জানান। ঐসব সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আলোচনা করতে তাঁরা মস্কোয় গিয়েছিলেন। মস্কোয়থাকাকালীন তাঁরা সোভিয়েত সংস্থা টেকনোএক্সপোর্ট এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। তৈল খননকার্যের গতি বৃদ্ধির জন্যই উপরিউল্লিখিত ঐসব সরঞ্জামের প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ২,৫০০ থেকে ৪,০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খননকার্যের জন্য যন্ত্রপাতি দিতে চেয়েছে। এছাড়া ৫,০০০ মিটার পর্যন্ত খননকার্যের উপযোগী সোভিয়েত যন্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনাও এখন রয়েছে। সফরকারী দুই সদস্য তাই জানান, "আমাদের আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ।"[৫৪]

ভারত-সোভিয়েত অর্থ নৈতিক সহযোগিতার পর্যালোচনা

ব্রেজনেভের ভারত সফরের প্রাক্কালে ১৯৭৩-এর ২০শে নভেম্বর দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পর্যালোচনা করা হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের ভিত্তি তৈরি করার জন্য এই আলোচনাই ছিল দুই দেশের 'প্রথম প্রধান অধিবেশন'।

এই অধিবেশনে নয় সদস্যের সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং সোভিয়েত যোজনা সংস্থার প্রধান শ্রী নিকোলাই বাইবাকভ এবং ভারতীয় দলের যোজনা-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর।

এই বৈঠককে 'প্রস্তুতিপর্ব' হিসাবে বর্ণনা ক'রে সরকারী সূত্র থেকে বলা হয়, দুই দেশ এই আলোচনায় ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন এবং বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ লক্ষ্যের দুই প্রতিনিধি দল নিজেদের কয়েকটি যুক্ত গ্রুপে বিভক্ত করেন এবং এক একটি গ্রুপ এক একটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা চালান। শ্রী ব্রেজনেভ ও শ্রীমতী গান্ধীর বিবেচনার জন্য ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক সহযোগিতার নমুনা তাঁরা তৈরি করেন। এই দুই নেতার সহযোগিতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের পেশ করতে হয়।

যুক্ত গ্রুপগুলি যেসব প্রস্তাব তৈরি করেন, ২৬শে নভেম্বর সোভিয়েত পার্টি প্রধানের আগমনের আগেই দুই প্রতিনিধিদলের এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তাতে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়।

'তাস'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রী ডি. পি. ধর বলেন, উভয় দেশের অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনশীল সংস্থাগুলিতে সহযোগিতার "দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।"

তিনি বলেন, অন্যান্য দেশে দ্রুত উন্নয়নের কাজে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির সম্ভাবনাও এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে।

ব্রেজনেভের সফরে যে সমস্ত অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে বিনিময়, বিদ্যুৎ উৎপাদন, তৈল সন্ধান, পেট্রো-কেমিক্যাল্‌স, সার, জাহাজ এবং খনি। ভারত-সোভিয়েত যুক্ত অর্থ নৈতিক কমিশন সম্প্রতি এক চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে ভিলাই ইস্পাত

কারখানার উৎপাদন ৭০ লক্ষ টনে এবং বোকারোর উৎপাদন এক কোটি টনে বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন।

রাশিয়া ভারত থেকে যেসব পণ্য আমদানি করতে পারে—বিশেষ ক'রে উচ্চ শ্রমমূল্যে উৎপন্ন এঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী—এবং ভারত যা যা রাশিয়া থেকে আমদানি করতে পারে সেসব ইতিমধ্যেই বাছাই করা হয়েছে এবং নয়াদিল্লীতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে চুক্তি সই হবার কথা, তাতেই ঐসব পাকাপাকি ভাবে স্থির হবে।

১৫ বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক চুক্তি

এখানে পৌঁছবার একদিন বাদেই শ্রীব্রেজনেভ শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দফার বৈঠকে মিলিত হ'ন। এই বৈঠকে তাঁরা অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত ১৫ বছর মেয়াদী সহযোগিতা-চুক্তিতে রূপদান করেন। ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭৩-এর সন্ধ্যায় ভারতীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে ঐ চুক্তির খসড়া আলোচিত হয়। এরপরই সোভিয়েত যোজনা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বাইবাকভ ও ভারতীয় যোজনা-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সম্ভবতঃ ঐ খসড়ায় চূড়ান্ত রূপ দেন।

এক দশক আগের আলোচনার মত এই শীর্ষ বৈঠক দুই' দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিরাট অগ্রগতির প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ। এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বোঝাপড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা চলছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে তারপর যেসব চুক্তি হয়ে চলেছে, তা সুনিশ্চিতভাবে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'গুণগতভাবে নতুন ও ইতিবাচক অগ্রগতির' লক্ষণ। ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৩, নয়াদিল্লীতে সোভিয়েত মুখপাত্র এল. এম. জামিয়াতিন ঐ কথাই বলেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সমভাবে উৎসাহজনক ঘটনা হচ্ছে সোভিয়েত নেতা কর্তৃক রাশিয়া সম্পর্কে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির উল্লেখ। সোভিয়েত জনগণ সম্পর্কে ভারতীয় কবি লিখেছিলেন, নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে তাঁরা 'সব্যসাচীর ভূমিকায়' অবতীর্ণ। ও কথার উল্লেখ ক'রে সোভিয়েত নেতা বলেন, "জনগণের আন্তরিকতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং মহান উদ্দেশ্যের জন্ত অসীম আত্মত্যাগ কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এরপরও বহু দশক পেরিয়ে গিয়েছে। আমরা তৈরি করেছি নতুন পৃথিবী। কিন্তু আমরা এখনও

সব্যসাচীর মত দুই হাতে সমানে কাজ ক'রে চলেছি, কারণ আমরা আরও অনেক অগ্রগতি ঘটাতে চাই।"

ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার দিকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ও জনগণ কি গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছেন, আলোচনার সময় শ্রীব্রেজনেভ তার উল্লেখ করেন। অসংখ্য জটিলতা সত্ত্বেও এই জাতি তার প্রচেষ্টায় যেসব সাফল্য লাভ করছে সোভিয়েত রাশিয়া তার যথেষ্ট মূল্য দেয় ব'লে তিনি মন্তব্য করেন।

শ্রীব্রেজনেভ বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিরাট সাফল্যে উৎসাহিত ভারতীয় জনগণের গঠনমূলক শক্তির প্রতি সোভিয়েত জনগণের আস্থা রয়েছে। ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা এই লক্ষ্য সাধনের কাজ আরও অনেক সহজ ক'রে তুলবে ব'লে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

'ইসকাফে'র এক সভায় শ্রীমতী গান্ধী বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী কোনভাবেই আমাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং বিপরীতে এই মৈত্রী আমাদের স্বাধীনতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। কারণ, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ছাড়া কোন স্বাধীনতা সম্ভব নয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের ঐ লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করছে।

এই সোভিয়েত সহযোগিতার একটি উদাহরণ: ভারতের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রুড তেল ও কেরোসিন সরবরাহে সম্মত হয়েছে।

১৯৭৪ সালে রাশিয়া ভারতকে ৩০ লক্ষ টন ক্রুড তেল ও ২৫ লক্ষ টন কেরোসিন সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন-মন্ত্রী শ্রী ডি. কে. বড়ুয়ার সঙ্গে তিনঘণ্টা-ব্যাপী আলোচনার সময় সোভিয়েত সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকোলাই বাইবাকভ ঐ প্রতিশ্রুতি দেন।

ভারতে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৯টি গভীর খনন-যন্ত্র সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এখন দেশের যে ভবিষ্যৎ জ্বালানী নীতি নির্ধারিত হতে চলেছে, বড়ুয়া-বাইবাকভ আলোচনার ভিত্তিতে তারও কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে।

১। কে. নীলকান্ত-এর পার্টনারস ইন পিস, এ স্টাডি ইন ইন্দো-সোভিয়েত রিলেশনস (নয়াদিল্লী), বিকাশ পাবলিকেশনস, ১৯৭২, পৃঃ ১৫০-৫৭। বইটিতে চুক্তির বক্তব্য Appendix I হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২। এল. এন. মিশ্র "ইন্দো-সোভিয়েত ট্রেডগ্রোথ স্পেকটাকুলার"—অমৃতবাজার পত্রিকা (কলিকাতা), ১৬ই জুলাই ১৯৭২।

৩। ভারত সরকারের যোগাযোগ-মন্ত্রী শ্রী এইচ. এন. বহুগুণার উদ্ধৃত পরিসংখ্যান "এক্সপ্যাণ্ডিং ইন্দো-সোভিয়েত কো-অপারেশন" (নয়াদিল্লী), ২৯শে অক্টোবর ১৯৭২, আরও দেখুন, কে. নীলকান্ত, পার্টনারস ইন পিস, নং ১, পৃঃ ৬২।

৪। মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ১৩ই মে, এই উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের তথ্যদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩, পৃঃ ৩, কলম ৪-৫।

৫। কে. নীলাকান্ত, নং ১, পৃঃ ৬২, বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ভারতস্থ সোভিয়েত ছাত্রাবাস প্রচারিত ১৯৭৩-এর ১০ই জানুআরির বুলেটিন (নয়াদিল্লী), পৃঃ ১-৩।

৬। এই উপলক্ষে ভারত সরকারের তথ্যদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন দেখুন।

৭। নীলকান্ত, নং ১, পৃঃ ৬৬।

৮। সোভিয়েত ল্যাণ্ড, নং ১১, পৃঃ ১-২, নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্যদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।

৯। ঐ।

১০। এই উপলক্ষে ভারত সরকারের তথ্যদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহার দেখুন।

১১। ঐ।

১২। হিন্দুস্থান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ১৯শে জুলাই ১৯৭২।

১৩। স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

১৪। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

১৫। ভারত সরকারের তথ্যদপ্তর প্রচারিত "প্রেস রিলিজ" দ্রষ্টব্য।

১৬। নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাস প্রচারিত, সোভিয়েত ল্যাণ্ড, সংখ্যা ২২-২৩, পৃঃ ৬।

১৭। নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্যদপ্তর থেকে ১৯৭৩ সালের ১০ই জানুআরি প্রচারিত ইস্তাহারের পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

১৮। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৬শে নভেম্বর ১৯৭২।
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানির অংশ ১৯৬০-৬১তে ৭·৩

শতাংশ থেকে ১৯৭১-৭২ সালে ২৩ শতাংশে আসে পূর্ব-ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে।

[নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্যদপ্তর থেকে ১৯৭৩ সালের ২৯শে জানুআরি প্রচারিত ইস্তাহারের পৃঃ ২-৩ দেখুন।]

১৯। নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য দপ্তর থেকে ১৯৭৩ সালের ১০ই জানুআরি প্রচারিত ইস্তাহারের পৃঃ ২ দেখুন।

২০। টাইম্স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭২।

২১। ঐ, ১০ই ফেব্রুআরি ১৯৬৩।

২২। ঐ।

২৩। ঐ।

২৪। ঐ।

২৫। পয়েণ্ট অব ভিউ (নয়াদিল্লী), ৩রা মার্চ ১৯৭৩, পৃঃ ৯।

২৬। টাইম্স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২৩শে জুন ১৯৭৩, পৃঃ ১, ৪র্থ কলম।

২৭। ঐ।

২৮। দি স্টেট্স্ম্যান (নয়াদিল্লী), ২২শে জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৯, ২য় কলম।

২৯। পেট্রিয়ট, ২৫শে জুলাই ১৯৭৩; পৃঃ ১, কলম ১। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য সোভিয়েত ল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী)-এ, অক্টোবর ১৯৭৩-এ প্রকাশিত আইভ্যান নেস্তেরেঙ্কোর, 'মথুরা জায়েণ্ট' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২-১৩।

৩০। স্টেট্স্ম্যান (নয়াদিল্লী) ২২শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ৯, কলম ৩ দ্রষ্টব্য।

৩১। ১৯৭৩-এর ২৯শে জুলাই নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য-দপ্তর প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির "নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ ফ্রম সোভিয়েত ইউনিয়ন"-এর Vol. XXXII, No. 168, P. 4-5.

৩২। ঐ, পৃঃ ৫।

৩৩। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ১।

৩৪। ঐ।

৩৫। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১০ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৪, কলম ৭-৮।

৩৬। ঐ, কলম ৭।

৩৭। ঐ।

৩৮। ঐ।

৩৯। ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১০ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ৬।

৪০। দি টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া, ১০ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ১, কলম ৮।

৪১। মাদারল্যাণ্ড (নয়াদিল্লী), ৩০শে অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৮, কলম ৭-৮।

৪২। স্টেট্‌স্‌ম্যান (নয়াদিল্লী), ১২ই অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৭, কলম ২।

৪৩। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ২২শে এপ্রিল ১৯৭৩।

৪৪। আরো জানবার জন্য দেখুন—টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ১১ই অক্টোবর ১৯৭২।

৪৫। নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন, ১৩ই জানুআরি ১৯৭৩, পৃঃ ৬৩।

৪৬। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

৪৭। আরও জানার জন্য দেখুন—নীলকান্ত, নং ১, পৃঃ ৭৩-৭৭।

৪৮। নয়াদিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ১৩ই জানুআরি প্রচারিত বুলেটিন দ্রষ্টব্য।

৪৯। ঐ, পৃঃ ২।

৫০। ঐ, পৃঃ ৩।

৫১। ১৯৭৩ সালের ১৭ই জানুআরি ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য-দপ্তর প্রচারিত বুলেটিন-এর পৃঃ ১-২ দেখুন।

৫২। হিন্দুস্থান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী), ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ১৯৭৩-এর ৬ই ডিসেম্বর রাজ্যসভায় শ্রীরাজবাহাদুরের ভাষণও দেখুন।

৫৩। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৩।

৫৪। দি সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড (নয়াদিল্লী), ১লা জুলাই ১৯৭৩, পৃঃ ৪, কলম ৬; তাছাড়া ১লা জুলাই ১৯৭৩-এর পেট্রিয়ট, পৃঃ ৫, কঃ ৪ দেখুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের নতুন দুয়ার উন্মোচিত করেছে। এই বিষয়ে অচলায়তন ভাঙার জন্য অনেকগুলি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ধাপে ধাপে মস্কোর সঙ্গে বন্ধন শক্তিশালী করার নীতি ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা ও মৈত্রীর বিরাট সম্ভাবনা এবং ভারতে বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপক কর্মকাণ্ড দ্রুততর করারই সঙ্কেত।

প্রোটোকল এবং চুক্তি

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য সোভিয়েত কারিগরি বিষয়ক পুস্তক অনুবাদের কাজ দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কোয় ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এইসব পুস্তকের উৎপাদনে ভারত তার অতিরিক্ত মুদ্রণ ক্ষমতা ব্যয় করতে সম্মত হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও এই পুস্তকগুলির ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।[১]

১৯৭১-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোয় স্বাক্ষরিত সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কিত চুক্তিতে ফলিত বিজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল তিনজন ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞের সফরের কথা, যাঁরা এই ক্ষেত্রে যুক্ত কাজের কর্মসূচী তৈরি করবেন।[২]

আবার ১৯৭২-এর ১৩ই মার্চ একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার কথা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের কথাও এতে উল্লেখিত আছে। ১৯৭২-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে ভারত-সোভিয়েত যুক্ত কমিটির আলোচনার পরই এই চুক্তি-স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। জল-হাওয়া বিদ্যার ক্ষেত্রে যুক্ত গবেষণা ও সহযোগিতা এবং চিকিৎসা ও পারমাণবিক প্রকল্প স্থাপনের বিষয় কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে ব'লে ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩]

২রা অক্টোবর, ১৯৭২, মস্কোয় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ফলিত

বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে ভারতের পক্ষে সই দেন শিল্পোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী সি. সুব্রহ্মনিয়ম এবং সোভিয়েত তরফে সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রের বিজ্ঞান-কারিগরি বিষয়ক কমিটির প্রধান ভ্লাদিমির কিরিলিন।

চুক্তিতে কারিগরি ক্ষেত্রে কাজকর্মের প্রসার, যুক্ত গবেষণা এবং তথ্য, বিশেষজ্ঞ, পেটেণ্ট ও সরঞ্জামের পারস্পরিক আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই চুক্তির যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সহযোগিতা-কর্মসূচী তৈরির জন্য নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করা হবে।

এই চুক্তির একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, চুক্তির ফলে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যাবে, তা কেউ অপরের পরিষ্কার অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় পক্ষকে সরবরাহ করতে পারবে না : এ থেকেই বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম পরে সাংবাদিকদের বলেন, অবিলম্বে যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত সাহায্যে ভারতে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও নথিকরণ ব্যবস্থা গঠন। তাঁর তালিকায় এ ছাড়া রয়েছে লেসার, কেলাসন বৃদ্ধি, সাইবারনেটিক্স্, ম্যাগনেটো-হাইড্রো ডিনামিক্স্, পেট্রোরসায়ন, যন্ত্রাংশ নির্মাণ, লৌহ ধাতুবিদ্যা, সমুদ্র বিজ্ঞান, পরিমাপক যন্ত্র সংরক্ষণ ও মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে যুক্ত গবেষণা এবং খনিজ ও তৈল উদ্ধারে যৌথ উদ্‌যোগ।[8]

ভারতকে চাঁদের মাটির নমুনা দিতে রাশিয়া রাজী

১৯৭২-এর ১০ই অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমী লুনা ১৬ ও ২০ দ্বারা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে প্রাপ্ত চাঁদের মাটির নমুনা ভারতকে দিতে সম্মত হয়।

জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঐ নমুনা গ্রহণ করেন এবং বোম্বাইয়ের টাটা ইন্‌স্টিটিউট অব্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চে ডঃ লাল-এর নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিকদের একটি দল ঐ নমুনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করবেন।[5]

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭২, ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে. সি. পন্থ সোভিয়েত বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা "ভি / ও ইলেকট্রোনর্গটেকনিকা" আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বৃহত্তম কমপিউটর বিক্রয়ের প্রস্তাব করেছে। তিনি জানান, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের ইলেকট্রনিক ও কমপিউটার ব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু জিনিস (soft-ware) রপ্তানি করতে পারে।[৬]

মহাকাশ গবেষণায় ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা দুই দেশের ক্রমবর্ধমান মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এই সহযোগিতা এক নতুন যুগের সূচনার প্রতীক।

১৯৭৩-এর ১৭ই মার্চ মহাকাশ কমিশন ১৯৭৪-এর মাঝামাঝি সোভিয়েতের কোন অঞ্চল থেকে সোভিয়েত উৎক্ষেপকের সাহায্যে ভারতে পরিকল্পিত ও নির্মিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ প্রকল্পকে অনুমতি দিয়েছে।

১৯৭৩ সালের ১৭ই মার্চ লোকসভায় মহাকাশ দপ্তরের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরি দাবি উত্থাপন করা হয়, তাতে বলা হয়, ঐ কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পনা ও অন্যান্য কাজ চলছে বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্রে উপগ্রহ সংক্রান্ত বিভাগে। কৃত্রিম উপগ্রহটি নির্মিত হবে বাঙ্গালোরে।

বিক্রম সারাভাই মহাকাশ সংস্থার মহাকাশ বিজ্ঞান কারিগরি কেন্দ্রের হাতে যেসব প্রধান প্রকল্পগুলি রয়েছে তার মধ্যেই আছে এস এল ভি-৩, ভারত-সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকল্প এবং বর্ধিত শক্তিসম্পন্ন প্লাসটিক কেন্দ্র প্রকল্প।[৭]

১৯৭২-এর ১৬ই অগস্ট ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির সভাপতি শ্রী কে. পি. এস. মেনন মহাকাশবিদ্যায় সোভিয়েতের অগ্রগতি সম্পর্কিত তামিল ভাষায় মোহন সুন্দ্ররাজন রচিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ব্রেজনেভ ভারতীয় স্পুটনিকের প্রতিশ্রুতি দিলেন

২৭শে নভেম্বর, ১৯৭৩, দিল্লীর লালকেল্লার প্রাঙ্গণে শ্রীব্রেজনেভকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঐ জনসমাবেশে তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ভারতের সঙ্গে বণ্টন ক'রে নিতে আগ্রহী। মহাকাশ অভিযানে দুই দেশ হাত মিলিয়ে চলতে পারে। শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, "সেদিন আর বেশী দেরি

নেই, যখন ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর আনুকূল্যে মহাকাশে স্পুটনিক উৎক্ষিপ্ত হবে।"

১। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

২। ঐ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৩। টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ১৪ই মার্চ, ১৯৭২।

৪। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বুলেটিন দেখুন

৫। টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী), ১১ই অক্টোবর, ১৯৭২।

৬। সোভিয়েত দেশ, ২৩-২৪ সংখ্যা।

৭। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৮ই মার্চ, ১৯৭৩।

সপ্তম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংহতি

পঁচিশ বছরেরও বেশী আগে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর উভয় দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের পরস্পরের দেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি[১] বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও তা ১৯৭১ সালের বিখ্যাত চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর। সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ও উন্নয়নে তখন সম্পূর্ণ এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মৈত্রীচুক্তি যে বন্ধুত্বকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে সুদৃঢ় ক'রে তোলে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। গত দু'বছরের মধ্যে দিনের পর দিন নতুন নতুন ঘটনা ঘটেছে এবং তা মানুষের অগ্রগতির নতুন আন্দোলনকে আরও সংহত আরও সুদৃঢ় ক'রে তুলেছে।

১৯৭১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোয় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৭১-৭২ সালের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৯৪ দফা এই কর্মসূচীটি ছিল পূর্বেকার বার্ষিক কর্মসূচীগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। সোভিয়েতের পক্ষে চুক্তিটিতে স্বাক্ষরদান করেন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন এবং ভারতের পক্ষে শিক্ষা দপ্তরের সচিব টি. পি. সিং।[২]

স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীফিরুবিন বলেন যে ১৯৭২ সালের সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় "ঐতিহাসিক চুক্তিটির অল্পক্ষণ পরই। এই চুক্তি আমাদের সকল সম্পর্ক এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছে।"[৩] তিনি আশ্বাস দেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তিটি পুরোপুরি-ভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।[৪]

শ্রী টি. পি. সিংও বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির প্রেক্ষাপটে প্রণীত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তিটি পূর্ববর্তী চুক্তিগুলি অপেক্ষা ব্যাপকতর ও অধিক অর্থবহ।[৫]

সোভিয়েত পাঠ্যপুস্তক ইংরেজী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার প্রশ্নও আলোচিত হয়। সে পর্যন্ত ১১০ খানা সোভিয়েত পাঠ্যপুস্তক ভারতীয়

ছাত্রদের হাতে এসেছে। চাহিদা যে আরও অনেক বেশী তা তখন উপলব্ধি করা হয়।

১৯৭২-৭৩ সালের জন্য আর একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ১৩ই মার্চ নয়াদিল্লীতে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সোভিয়েতের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এ. স্মিরনভ এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের সচিব টি. পি. সিং। এই চুক্তিতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা, সিনেমা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া, কৃষি ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে সহ-যোগিতার কথা বলা হয়েছে।

এতে শিক্ষাবিদ্, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, ক্রিড়াবিদ্, নৃত্য ও সঙ্গীত-শিল্পিদল, পুস্তক, বেতার ও টেলিভিশন প্রচার ও চলচ্চিত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তিগুলি ছিল একবছর মেয়াদী কিন্তু এটির মেয়াদ ছিল দু'বছর।

এই কর্মসূচীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৩০টির বেশী বিনিময়ের বিষয় ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এতে শিক্ষক ও ছাত্রদের দীর্ঘমেয়াদী সফর ছাড়া প্রতি দেশের সাড়ে তিনশোর বেশী ব্যক্তির সফর বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। এক সম্প্রসারিত কর্মসূচীর মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা চলবে। এই কর্মসূচীতে সম্মিলিতভাবে পাঠ্য-পুস্তক রচনায় সহযোগিতার জন্য বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য প্রকাশকেরাও একে অপরের দেশ সফর করবে।[৬]

সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের সময় আঁদ্রে স্মিরনভ উভয় দেশের পক্ষে এই চুক্তির তাৎপর্য গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে এতে ভারত ও সোভিয়েতের জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে এবং এটি ভারত-সোভিয়েত চুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশা ব্যক্ত করেন যে ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক এই নতুন চুক্তির বিভিন্ন কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণে উভয় দেশই কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

১৯৭২ সালের ৩০শে নভেম্বর মস্কোয় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনের এই চুক্তির মেয়াদ আরও দশ বছর বৃদ্ধি ক'রে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। মস্কোয় মৈত্রীভবনে এক অনুষ্ঠানে এই প্রটোকলটি

স্বাক্ষরিত হয়। প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় সংসদ সদস্য শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন এবং শ্রীনিকোলাই গোলডিন।[৭]

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বন্ধন প্রসারিত হবে

দু'দেশের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্যাদি বিনিময় আরও ধারাবাহিক ও ব্যাপক হবে। এই উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর পক্ষ থেকে ভারতীয় সংসদের একজন সদস্য মস্কোয় এক নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

উক্ত সংসদ সদস্য মস্কো থেকে ফিরে এসে বলেন যে উক্ত পরিকল্পনায় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া পাওয়া গেছে এবং ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে এটিকে একটি চুক্তির আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হবে।

পরিকল্পনাটি ছয় দফা। এতে একটি যুক্ত কমিশন গঠন, ছাত্র, দলিলপত্র ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, দ্বি-বার্ষিক আলোচনাচক্র, যুক্ত গবেষণা, এবং উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের জন্য গ্রন্থ ও রচনার অনুবাদ প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।[৮]

ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী এর কতকগুলি কর্মসূচী যে ইতিমধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে, তবে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এইসব বিনিময়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী চালিত করা।

সমাজবিজ্ঞানের অনেক শাখায় ভারত যে অনেক উন্নত তা সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকার করে। তাই এই ব্যাপারে পরিকল্পিত বিনিময় দু'দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে।

তাই ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এই সুবিস্তৃত ও আকর্ষণীয় প্রেক্ষাপট রয়েছে। ভারত-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চবিংশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং তাঁর বাণীতে বলেছেন, "আমাদের যোগাযোগ হয়েছে আবেগ-উষ্ণ, নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ এবং তা উভয় দেশের মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছে।"

ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই এপ্রিল। তার রজতজয়ন্তী পালন উপলক্ষে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সমাবেশ

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির প্রথম বার্ষিকী এবং ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীমাস অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার স্পীকার এবং ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির রাজ্যশাখার সভাপতি শ্রী পি. আর. রেড্ডির নেতৃত্বে ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল অতিথি হিসেবে এই উৎসবে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিনিধিদল মস্কো, কিয়েভ, লেনিনগ্রাদ, মিন্স্ক, সমার্খন্দ, তাসখন্দ ও অন্যান্য শহর পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী রেড্ডি তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর সম্পর্কে 'মস্কো নিউজ'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে বলেন :

> সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্রই আমাদের গভীর আবেগভরা সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। শুধু মৈত্রী সমিতির সদস্যদের কাছেই নয়, কারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানেই আমরা গিয়েছি সেখানেই পেয়েছি এই সম্বর্ধনা। আজ একটা শিক্ষায়তনে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে দেখে আমরা যে কত খুশী হয়েছি তা আর কি বলব। এই শিক্ষায়তনের ছাত্রেরা শুধু হিন্দীই শিখছে না, শিখছে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি। তারা ঠিক একজন ভারতীয় মেয়ে বা ছেলের মত চমৎকার নাচছে দেখে আমরা সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।

মৈত্রীভবন সফরের সময় আমরা ভারতে 'ইসকাস'-এর কার্যকলাপ এবং এখানে সোভিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সমিতির কার্যকলাপ ও কর্মসূচী সম্পর্কে মত বিনিময় করি। ভারতের স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব এই বিরাট দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে পালিত হয়েছে এবং এখনও তা পালিত হচ্ছে জানতে পেরে আমরা খুশী হয়েছি।[৯]

'ইসকাস'-এর সহ-সভাপতি এবং 'ন্যায়তন্ত্র' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এ প্রভুও তাঁর মন্তব্যে বলেন :

সোভিয়েতের বাস্তব অবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনাদের দেশে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে তা নিজের চোখে দেখে আমি খুশী হয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের মিত্র। তার সাফল্য আমাদের নিজেদের সমাজে রূপান্তর ঘটাবার প্রেরণা যোগায়। ৫৫ বছর ধরে সোভিয়েতের

জয়যাত্রা সকল দেশকেই প্রভাবিত করেছে……আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আমাদের দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী দু'দেশের পক্ষ থেকেই সাফল্যের সঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার কাজে আমি আত্মনিয়োগ করেছি। এজন্য আমি আনন্দিত এবং এই কাজ আমি সর্বান্তঃকরণে ক'রে চলেছি।[৩০]

ভারতের শান্তি কামনা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করেছে

ভারতের জনগণ বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এই উপমহাদেশে এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশেও শান্তি চায়, চায় উত্তেজনার প্রশমন।

সোভিয়েত শান্তি কমিটি এবং সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির চার সদস্যক প্রতিনিধিদল পক্ষকাল ধরে এ দেশ সফর এবং কয়েকশ' লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে এই ধারণাই লাভ করেন।

তাঁদের সফরান্তে ১৯৭৩ সালের ১১ই জুন নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদলের নেতা বাহাদুর আবদুর রাজাকভ বলেন যে দেশের সকল অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁর ও প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারত একাগ্রভাবে শান্তি কামনা করে। তারা জানে যে বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্যে উন্নয়নের গতি সঞ্চারে শান্তি একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য মিঃ রাজাকভ বলেন, ভারতের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও মৈত্রীও প্রকাশ করেন। "এই মৈত্রীকে সুদৃঢ় ক'রে তুলতে হবে।" প্রতিনিধিদল প্রায় ২৫টি শহর সফর করেন এবং ৬৫টিরও বেশী সভায় বক্তৃতা করেন। বহু নেতা এবং সংসদ ও বিধানসভাগুলির অনেক সদস্যের সঙ্গেও তাঁরা আলোচনা করেন। উপমহাদেশের দেশগুলির অমীমাংসিত সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং ভারত-বাংলাদেশ ঘোষণায় অসামরিক অন্তরীণ ও যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্ন মানবিক দিক থেকে মীমাংসার যে প্রস্তাব করা হয় তাতে তাঁরা অভিনন্দন জানান।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এবং শান্তি ও সংহতি কমিটি সর্বদাই এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে ভারতীয় নেতারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উভয় পক্ষই বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন শক্তিশালী করা এবং এই সংগ্রামের মঞ্চে যত বেশীসংখ্যক সম্ভব সামাজিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশী প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।

নিখিল ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা এবং প্রতিনিধিদল কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শান্তির জন্য সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আরও উন্নতিবিধানে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

লোকসভার সদস্য এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার কার্যনির্বাহক পরিষদের সভাপতি শ্রী কে. ডি. মালব্য প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বলেন, বিশ্বপরিস্থিতি এখন শান্তির পথে নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই এই সময় প্রতিনিধিদের এই সফর অভিনন্দনযোগ্য। তিনি শান্তির শত্রুদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী শক্তিগুলির ঘনিষ্ঠতা ও সংহতির আহ্বান জানান।[১১]

ব্রেজনেভের সফর

সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ ১৯৭৩ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারত সফরে আসেন। এতে বিশ্বশান্তি এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হয়। তাঁর সফরকালে দু'দেশের মধ্যে 'সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ' আলোচনা হয়।

ব্রেজনেভের ভারত সফর অনেকদিন ধরেই প্রত্যাশিত ছিল। ভারত সরকার অনেকদিন আগেই তাঁকে এদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ বছরের গোড়ার দিকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মস্কো সফরে গিয়ে তাঁকে নতুন ক'রে আবার এই আমন্ত্রণ জানান।

মিঃ ব্রেজনেভ পাঁচদিনের জন্য সরকারী সফরে নয়াদিল্লী এসে পৌঁছলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি এবং শ্রীমতী গান্ধী দু'জনেই আশা করেছিলেন যে, এই সফরে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার প্রসার ঘটবে।

বিমান বন্দরে সাড়ম্বর সম্বর্ধনায় এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবার পথেও দিল্লীর জনগণ ভারতের প্রকৃত বন্ধুদের অন্যতম হিসেবে মিঃ ব্রেজনেভকে হর্ষধ্বনি ক'রে অভিনন্দন জানান। সেই মোটর বাহিনী দেখবার জন্য লক্ষ

লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন রাজপথের উভয় পার্শ্বে। মিঃ ব্রেজনেভ ভারতীয়-দের মন যে কতখানি দখল ক'রে আছেন এতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিমান বন্দরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ব্রেজনেভ এই আবেগভরা অভিনন্দনে সাড়া দিয়ে বলেন যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী আরও সুদৃঢ় এবং সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য।

তাঁর মন্তব্যে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান জনগণের মধ্যে মৈত্রী এশিয়া, বস্তুতঃ সারা বিশ্বেই শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

ভারত সফরে আগত কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে ২১বার তোপধ্বনি সহ সাধারণতঃ যেসব অনুষ্ঠান ক'রে অভ্যর্থনা করা হয়, মিঃ ব্রেজনেভকেও ঠিক সেইভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। মিঃ ব্রেজনেভ তাসখন্দ থেকে সাদা-নীল ইলিউসিন ৬২ বিমানে দিল্লীতে আসেন। বিমান থেকে অবতরণ করা মাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, দিল্লীর মেয়র, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং এক ধ্বনি-মুখর বিরাট জনতা।

বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান চলে আধ ঘণ্টা ধরে এবং সারাক্ষণ ধরেই ধ্বনি উঠতে থাকে "কমরেড ব্রেজনেভ, দ্রুঝবা" (কমরেড ব্রেজনেভ, বন্ধু)। তারপর অতিথিকে নিয়ে মোটর বাহিনী যখন চলছিল শহরের দিকে তখনও পথিপার্শ্বস্থ জনতার ভেতর থেকে এই ধ্বনি উঠতে থাকে। মিঃ ব্রেজনেভ মস্কোর রাজপথে প্রায়ই এই ধরনের জনতা দেখেছেন, তবে এখানে রাজপথে এই জন-সমাবেশ দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধানকে "এক মহান ও মিত্র-দেশের বিশিষ্ট নেতা" ব'লে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে গত ১২ বছরে ভারতে তথা সারা বিশ্বে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেলেও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং তা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি বলেন, এটা লক্ষণীয় যে উভয় দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একই মত পোষণ করে এবং বিশ্বসংস্থাসমূহে শান্তিকে অভিন্ন লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছে।

বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনে মিঃ ব্রেজনেভের 'বিশেষ অবদান'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন শ্রীমতী গান্ধী। তিনি বলেন, মিঃ ব্রেজনেভের এই সফর

ফলপ্রসূ এবং পরস্পরের পক্ষে লাভজনক হবে এই আশায় ভারতের জনগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২৭শে নভেম্বর লিওনিদ ব্রেজনেভ দু'দেশের মধ্যে 'চিরন্তন মৈত্রীর' কামনা প্রকাশ করেন।

লাল কেল্লার মাঠে নাগরিক সম্বর্ধনাসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, "অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আপনাদের উত্থান-পতন, আপনাদের সুখ-দুঃখের শরিক হতে চায়। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং আমাদের এই মৈত্রীর বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।"

মিঃ ব্রেজনেভ বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভারত এক বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রে রয়েছে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে তাঁর এইদেশ সফরের ফলে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর মহান ইতিহাসে এক নতুন ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হবে। তিনি বলেন, "সোভিয়েতের জনগণ দু'দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর বন্ধনকে মূল্যবান ব'লে মনে করে এবং মনে মনে তা কামনা করে।"

সোভিয়েত নেতা বলেন যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ভারতে প্রমোদ সফরে আসেন নি, এসেছেন ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক কি ক'রে সবচেয়ে ভালভাবে সুদৃঢ় করা যায় সে সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য। তিনি বলেন যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের বহুমুখী প্রসার ঘটিয়ে এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

লিখিত এই বক্তৃতায় উপমা ও অলঙ্কার ছিল প্রচুর। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী 'কম্পাস' বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত যা সব সময়ই দু'দেশকে পথনির্দেশ করে। তিনি বলেন, "আমাদের বন্ধুত্ব ভিলাই ইস্পাত কারখানার ইস্পাতের মতই কঠিন ও মজবুত।" এই মৈত্রী বৈরী আন্তর্জাতিক রাজনীতির 'ঝড়' কাটিয়ে উঠেছে এবং এখন 'মনোরম আবহাওয়ায়' সম্মুখ অভিমুখে আনন্দ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ফল 'সুমিষ্ট' হয়েছে এবং তা আরও সুমিষ্ট হবে ব'লে দু'দেশের মানুষ আশা করতে পারে। 'ভারতের জনগণ এবং তাদের সুখ-আনন্দের কথা সব সময়ই আমাদের চিন্তায় রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "ভারতের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই হচ্ছে আমাদের নীতির মূল লক্ষ্য।"

মিঃ ব্রেজনেভ বলেন যে ভারত সোভিয়েত মৈত্রী শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের

নীতির ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। এই মৈত্রীর মূল এখন গভীরে প্রবেশ করেছে, কারণ, দু'দেশের জনগণের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাহচর্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। "নিরাপত্তার" প্রশ্নের দিক থেকেও এই মৈত্রী শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, একান্ত প্রয়োজন। এর লক্ষ্য হচ্ছে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে উত্তেজনার প্রশমন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ রচনা।

সোভিয়েত নেতা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বহু বিষয়ে মিল লক্ষ্য করেন। উভয় দেশই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধী এবং শান্তি ও ন্যায়ের প্রবক্তা। দু'দেশেরই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে।

মিঃ ব্রেজনেভ বলেন যে ইতিপূর্বেও একবার তাঁর ভারত ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়েছিল। সে ১২ বছর আগের কথা। তখন বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, নেয়েভেলি, জয়পুর ও আগ্রায় তিনি যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তার সুমধুর স্মৃতি এখনও তাঁর মনের কোঠায় জেগে রয়েছে।

১২ বছর পরে এখন ভারত সফরে এসে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ভারত এখন এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ ক'রে মিঃ ব্রেজনেভ বলেন যে এই আলোচনা যে বহু দিক থেকে বিশেষ ক'রে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ভারতের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন কোন কোন শক্তি যে ভারতকে আত্মনির্ভর হতে দিতে চায় না তা তিনি জানেন। তিনি বলেন, "তবে সোভিয়েত জনগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি লক্ষ্য ক'রে আনন্দ বোধ করে।"

ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে বটে তবে এখনও এই সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিশাল ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যেসব জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম চলছে মিঃ ব্রেজনেভ তারও উল্লেখ করেন। সংগ্রামী জনগণ চায় এক নতুন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা এবং তাদের এইসব সংগ্রাম বিশ্বরাজনীতিতে এখন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এখনও এমন সব শক্তি আছে যারা চায় এই সংগ্রামকে ব্যর্থ ক'রে দিতে।

১৯৭৩ সালের ২৭শে নভেম্বর মিঃ ব্রেজনেভ তিন ঘণ্টা ধরে সোভিয়েত

ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কয়েক দশক ধরে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর যে বিকাশ ঘটেছে তার 'চমৎকার' বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন যে তাঁর ভারত সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুণগত ও আধেয়গত উন্নতি হয়েছে।

পাঁচদিনব্যাপী স্বভেচ্ছা সফরে রাজধানীতে এসে পৌছবার ছয়ঘণ্টা পরই সোভিয়েত নেতা ও তাঁর প্রতিনিধিদল শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সহকর্মী ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে সরকারীভাবে প্রথম দফায় আলোচনা করেন।

মিঃ ব্রেজনেভ বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা 'ক্রমবর্ধমান বিষয়বস্তুতে' পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এটা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যা ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের আদর্শ হতে পারে। ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অতীতে 'কিছুই এই সম্পর্ককে ম্লান করেনি।' আগে কখনও এই সম্পর্ক এত সুদৃঢ় ছিল না।

শ্রীমতী গান্ধী ও মিঃ ব্রেজনেভ প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এক বৈঠকে ৩৫ মিনিট ধরে প্রাথমিকভাবে মত বিনিময় করেন। তারপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য সাউথ ব্লকের কন্‌ফারেন্স হলে তাঁরা প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন।

পূর্বেকার সফরের ১২ বৎসর পরে মিঃ ব্রেজেনেভ যে সময় ক'রে আবার ভারত সফরে এসেছেন সেজন্য শ্রীমতী গান্ধী নাকি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিপুল সম্ভাবনা হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেন।

তারপর মিঃ ব্রেজনেভ ভারতীয় ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সামনে যে বক্তব্য রাখেন তাকে "অত্যন্ত চমৎকার, আকর্ষণীয় ও সতেজ" বিবৃতি ব'লে বর্ণনা করা হয়। এতে প্রধানতঃ ২টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির জন্য যে নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে এবং সোভিয়েত জনগণ এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে 'সৃজনমূলক প্রচেষ্টা' চালান তার বর্ণনা। দ্বিতীয়টি ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের বিষয়ে।

সোভিয়েতের অভ্যন্তরীণ চিত্রের বর্ণনায় মিঃ ব্রেজনেভ যে উদ্দেশ্যাবলীর দ্বারা সোভিয়েতের নীতিগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছে শুধু সেগুলিরই উল্লেখ করেন না, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত যে রুশ মহাকাব্য

রচিত হয়েছে তারও ঐতিহাসিক বিবরণ দেন। প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী মিঃ ব্রেজনেভের বিবৃতিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিশেষ ক'রে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সৃষ্টিতে তাঁর মহান ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানান।

সোভিয়েত নেতাও বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তিনি বলেন, সোভিয়েত নেতারা "শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় রাজনীতিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা" পোষণ করেন। উভয় দেশের মানুষই এই সফর থেকে অনেক-কিছু লাভ হবে ব'লে আশা করেন। এই প্রত্যাশার মূল কারণ হচ্ছে, উভয় দেশই "শান্তির জন্য" কাজ ক'রে চলেছে। এইসব আলোচনায় মিঃ ব্রেজনেভের মন্তব্যের সারমর্ম সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয় ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৩ এবং সেটি দেন 'তাস' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য মিঃ এল. এম. জামিয়াতিন এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ কেবল সিং।

মিঃ জামিয়াতিন বলেন যে আজকের সরকারী আলোচনা সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কি বলা হবে তা তিনি মিঃ ব্রেজনেভের কাছে বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জবাব দেন: দু'দেশের মধ্যে বর্তমান সহযোগিতার পথ অনুসরণ ক'রে চলার সঙ্কল্প এই বৈঠকে দু'পক্ষই পুনর্বার ঘোষণা করেছেন।

পরে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৩, রাষ্ট্রপতিভবনে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন-ভাষণের জবাবদান-প্রসঙ্গে তিনি এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, "আমরা সানন্দে আমন্ত্রণ (ভারত সফরের) গ্রহণ করেছিলাম।"

ইসকাসের সম্বর্ধনা

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বন্ধুত্ব জীবনকে ক'রে তোলে পূর্ণতর কিন্তু দু'দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের তাৎপর্য আরও বেশী, কারণ তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে ভবিষ্যৎকে—২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৩, নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞানভবনে তাঁর সম্মানে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ব্রেজনেভ এই মন্তব্য করেন।

এই উপলক্ষে বিজ্ঞানভবনের প্রধান কক্ষটি সারি সারি রক্তপতাকা ও ত্রিবর্ণ পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

সভায় মিঃ ব্রেজনেভ আবার ঘোষণা করেন, "আমাদের মৈত্রী অমর, অক্ষয়, অব্যয়।" মিঃ ব্রেজনেভ বলেন, "এই মৈত্রীর এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, রয়েছে দু'দেশের মহান জনগণের এক বিশেষ ভূমিকা। তাঁরাই গ'ড়ে তুলেছেন এই মৈত্রী, তাঁরাই রয়েছেন এই বন্ধুত্বের মূলে।"

গত তিনদিন ধরে নয়াদিল্লীতে সর্বত্র তিনি যে আবেগ-উষ্ণ ও প্রীতিপূর্ণ সম্বর্ধনা লাভ করেছেন তার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, "প্রকৃত বন্ধু এক মহান সম্পদ এবং জীবনকে তিনি ক'রে তোলেন পূর্ণতর" তবে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। ভবিষ্যৎকালের ওপর তা বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। তিনি আরও বলেন, "বিশেষভাবে অনুকূল ও আনন্দদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এই বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ এবং আরও সুদৃঢ় ক'রে তুলছি।"

মিঃ ব্রেজনেভ এই সভায় উপস্থিত হন শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে। তিনি একটি লাল গোলাপ কুঁড়ি দর্শকদের দিকে তুলে ধ'রে তাদের সহর্ষ অভিনন্দন গ্রহণ করেন। বক্তৃতামঞ্চের সামনে ও পাশে থরে থরে সাজানো ছিল 'ইসকাস'-এর বিভিন্ন রাজ্যশাখার প্রতিনিধিদের অসংখ্য উপহার। উপহারগুলি গ্রহণ ক'রে মিঃ ব্রেজনেভ 'ইসকাস'কে উপহার দেন একখানি তৈলচিত্র। তাতে অঙ্কিত ছিল রেড স্কোয়ারের চিত্র, পটভূমিতে তার ক্রেমলিনের উত্তুঙ্গ চূড়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে ভারতের জনগণের অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল তিনি লেনিনকে উদ্ধৃত ক'রে তার উল্লেখ করেন। তিনি উপকথার এক যুবরাজের কাহিনীও বর্ণনা করেন যিনি তাঁর বাহুবলে শেষ পর্যন্ত সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছিলেন এবং বলেন যে আজ জনগণই হচ্ছে সেই উপ-কথার যুবরাজ এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেই বাহুবল।

শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত নারীদের বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন বিশ্বগঠনে তাঁরা যে মহান ভূমিকা পালন ক'রে চলেছেন তার জন্য তিনি "তাঁদের বিশেষ শুভেচ্ছা" জানাতে চান। তাঁদের আদর্শ জাতিগঠনে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে ব'লে তিনি মন্তব্য করেন।

এই সভার সমগ্র ধারাবিবরণী সোভিয়েত ইউনিয়নে টেলিভিশনে এবং দিল্লীর টেলিভিশন কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত হয়।

পি টি আই-এর সংবাদে আরও বলা হয়, মিঃ ব্রেজনেভ ঘোষণা করেন

যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র জনসাধারণ "আপনাদের (ভারতের) বন্ধু— এক বিশ্বস্ত, নিঃস্বার্থ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোভিয়েত রাজনীতিক সভাস্থলে এসে পৌঁছলে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ ক'রে মিঃ ব্রেজনেভ বলেন যে "ভারতে আমাদের এই সফর এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে", একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। 'ইসকাস'-এর সভাপতি শ্রী কে. পি. এস. মেনন তাঁর স্বাগত ভাষণে মিঃ ব্রেজনেভকে ভারতের একজন মহান বন্ধু ও একজন নায়ক ব'লে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে ভারতে তাঁর এই সফরে "ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমবর্ধমান, ক্রমপ্রসারমাণ মৈত্রীর গ্রন্থিতে সর্বশেষ যোগসূত্র, একটি স্বর্ণ যোগসূত্র গ্রথিত হ'ল।"

মিঃ ব্রেজনেভকে প্রদত্ত উপহারগুলির মধ্যে ছিল একটি মোগলী হুকা এবং একটি পারসিক ধরনের পিতলের সুরাপাত্র।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৩, 'প্রাভদায়' মিঃ ব্রেজনেভের এই ভারত সফরকে সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব'লে মন্তব্য করা হয়। চীন এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সফরের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সে সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় বলা হয় যে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সুদৃঢ় হয়ে উঠায় কোন্ কোন্ মহল যে অখুশী হবে তা বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়। প্রাভদায় পশ্চিমী দেশগুলির কোন কোন সংবাদপত্রে অসত্য বিবৃতি প্রকাশের অভিযোগ করা হয়।

স্মরণ করা যেতে পারে যে মিঃ ব্রেজনেভের সঙ্গে এসেছিলেন একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল। সোভিয়েত নেতা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারত-সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল।

সোভিয়েতের নগর প্রশাসন ব্যবস্থা দেখে সাহনী মুগ্ধ

দিল্লী পৌরসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে দিল্লীর মেয়র শ্রী কে. এন. সাহনী সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি বড় বড় শহর সফর করেন। মস্কোয় একজন সংবাদদাতার কাছে সোভিয়েতের নগর প্রশাসন ব্যবস্থা দেখে তাঁর যে ধারণা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রীসাহনী

বলেন যে সোভিয়েতের নগর প্রশাসন ব্যবস্থা বিশেষ ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই বৃহত্তম শহর—মস্কো ও লেনিনগ্রাদের প্রশাসন ব্যবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এই শহরগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তাদের পরিবহণ ব্যবস্থা এবং তারা যেভাবে গৃহসমস্যার সমাধান করেছে তা দেখে।

শ্রীসাহ্নী বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে পারস্পরিক প্রতিনিধিদল বিনিময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।" তিনি বলেন যে সারা দুনিয়ার শহরগুলি একই ধরনের সমস্যাবলীর সন্মুখীন হয় এবং প্রত্যেক শহরেরই অন্যান্য শহরকে শিক্ষা দেবার কিছু আছে। তিনি বলেন, সেদিক থেকে এবং দিল্লীর সমস্যা-বলীর দিক থেকে তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর অত্যন্ত হিতকর হয়েছে। তিনি বলেন যে তিনি মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মেয়রদের দিল্লী সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শ্রীসাহ্নী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, "একথা বলতেই হবে যে মস্কো ও লেনিনগ্রাদ অত্যন্ত সুশাসিত দুটি শহর এবং শহর দুটির উন্নয়নে ভারপ্রাপ্ত রয়েছেন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা। সমস্যাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করছেন। শহরগুলির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রয়েছে এবং আমি দেখেছি সেগুলি ফলপ্রদভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে।"[১২]

ভারতীয় প্রতিনিধিদল কতকগুলি আবাসগৃহ অঞ্চল (হাউজিং সাইট) পরিদর্শন করেন এবং সেগুলিতে বাসিন্দাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাদি জেনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। প্রতিনিধিদল মস্কো শহরের বিরাট প্রশাসন ব্যবস্থা বিশেষ ক'রে তার পরিবহণ সংস্থা দেখেও অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা পরিবহণ, নিউইয়র্কের চেয়ে সস্তা সাত গুণ। ভূগর্ভ রেলপথ ব্যবস্থা, তার সজ্জা, পরিচ্ছন্নতা এবং সর্বোপরি তার নিপুণতা দেখে শ্রীসাহ্নী অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

মস্কো নগর সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির চেয়ারম্যান ভ্লাদিমির প্রোমিসলভ ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা করেন এবং ভারত ও সোভিয়েতের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠায় আনন্দ প্রকাশ করেন।[১৩]

শ্রীসাহ্নী মস্কোর মেয়রকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অবিচলভাবে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেকথা ভারতের জনগণ কোনদিনই ভুলবে না।

শ্রীসাহ্নী সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের প্রশংসা ক'রে বলেন, "মনে হচ্ছে, রাশিয়ার জনগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী, অতিথিপরায়ণ, সামাজিক এবং গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এইসব গুণই একটি দেশকে মহান ক'রে তোলে। স্বভাবতই তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বহু দেশেরই অনেক-কিছুই শেখার আছে।"[১৪]

সোভিয়েত ইউনিয়নে এস. ডি. শর্মার সফর

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীশঙ্কর দয়াল শর্মা সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন দেশ সফর ক'রে ফিরে এসে ২৪শে জুলাই, ১৯৭৩, নয়াদিল্লীতে 'তাস'-এর সংবাদদাতার কাছে বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে তাঁর ফলপ্রসূ বৈঠক ও আলোচনা হয়। এইসব বৈঠকে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং বিশ্বে শান্তি সুসংহত করার বৃহত্তর প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ডঃ শর্মা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে তাঁর যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়, তার সবিশেষ উল্লেখ করেন। এই বৈঠকে বহু জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে মতৈক্য প্রকাশ পায়।

ডঃ এস. ডি. শর্মা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সোভিয়েত-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই চুক্তি দু'দেশের মধ্যে দু'দেশের পক্ষেই কল্যাণকর যোগসূত্রগুলির সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণে এক গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ ক'রে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সফর এই যোগ-সূত্রগুলিকে আরও সুদৃঢ় করার পক্ষে সহায়ক হবে।"[১৫]

ডঃ শর্মা সদলে 'ইজভেস্তিয়া'র সম্পাদকীয় দপ্তরও সফর করতে যান এবং সেখানে 'ইজভেস্তিয়া'র সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস সভাপতি বলেন যে অনেকদিন ধরেই সোভিয়েত জীবনধারার সঙ্গে তাঁর পরিচিত হবার বাসনা ছিল এবং এই সফর তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি বলেন যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাশিত আবেগ-উষ্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছেন এবং ভারত ও ভারতের জনগণের প্রতি তাঁদের সহৃদয় মনোভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের জনগণ সোভিয়েতের জনগণকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ও পরীক্ষিত বন্ধু ব'লে মনে করেন এবং তাঁদের প্রতি গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন।[১৬]

সোভিয়েত নেতাদের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর অভিনন্দন

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে অভিনন্দন বাণী পাঠান।

'তাস'-এর সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, গত দু'বছরের মধ্যে এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটে গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নিয়েছে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। "আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে স্থায়িত্ব, মৈত্রী ও সহযোগিতা সুদৃঢ় করার জন্য ভারতে আমরা অনেকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নও আন্তর্জাতিক শান্তি সুসংহত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারত-সোভিয়েত চুক্তি শান্তি ও পারস্পরিক সমঝোতার এক আবহাওয়া সৃষ্টির ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, চুক্তিটি দুটি মিত্র দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছে। "আমরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যাপকতর করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের এই প্রয়াস উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও আমরা আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাব।"[১৭]

ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোভিয়েত নাগরিকেরা বিমুগ্ধ

দু' পক্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চলেছে অব্যাহতভাবে। সম্প্রতি ১৬ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় বড় শহরগুলি সফর করেন। এই দলে ছিলেন বীরজু মহারাজ, বেগম আখতার, দীপালি নাগ প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের নৃত্য-গীত পরিবেশন ক'রে সোভিয়েত দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। তাঁদের প্রথম নৃত্য-গীতানুষ্ঠান হয় মস্কোয়। অনুষ্ঠানকালে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সারা কক্ষে। কি গভীর আগ্রহ নিয়ে যে দর্শকরা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছিলেন তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাঁদের চোখে-মুখে। ভারতীয় শিল্পীরা পরে সোভিয়েত নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয় দেশের শিল্পকলা-রীতির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় নৃত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ভাবাবেগ ও আত্মিক সম্পদ এবং ভারতীয়

নৃত্যশিল্পী এতে সম্পূর্ণরূপে বিভোর হয়ে থাকেন একথা সোভিয়েত নৃত্যশিল্পীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করেন। আর ভারতীয় শিল্পীরা সোভিয়েত নৃত্যের অতি সূক্ষ্ম কলা-কৌশল দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন।[১৮]

সোভিয়েত মঞ্চে রামায়ণের বিরাট সাফল্য

বেশ কিছুকাল ধরে দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে এক নতুন উপাদান সংযোজন করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মস্কোর সেণ্ট্রাল চিলড্রেন্স থিয়েটারে এক নতুন 'সিজ্ন' খোলা হয়েছে। সোভিয়েত, রুশ ও পশ্চিমী নাটকাভিনয় এর অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬০ সাল থেকে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্ এন. গুসেভা লিখিত 'রামায়ণ' নাটক মস্কোয় মঞ্চস্থ করা হচ্ছে এবং নাটকখানি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে মহাকাব্যখানির প্রধান প্রধান ঘটনাপ্রবাহ দর্শন করেন, রামের মহত্ত্ব ও বীরত্ব, সীতার পতি-ভক্তি ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃসুলভ আনুগত্যের উচ্চ প্রশংসা করেন, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন রাবণের শঠতায় এবং শেষপর্যন্ত রামের জয়লাভে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। শিশু ও যুবকদের মধ্যে এই নাটকখানি দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

'রামায়ণ' নাটকের জন্য এন. গুসেভাকে জওহরলাল নেহরু পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

রামের ভূমিকায় জেন্নাদি পেত্চনিকভ বহুবার অভিনয় করেছেন এবং তাতে আনন্দও পেয়েছেন। সোনার হরিণের ঘটনার পর বনের মধ্যে পর্ণকুটীরে রামের প্রত্যাবর্তন—এই বলিষ্ঠ দৃশ্যটির অভিনয় করতে তাঁর খুবই ভাল লাগে।

ইউনেস্কো সারা বিশ্বে মধ্যযুগীয় হিন্দীভাষায় রামায়ণ রচয়িতা মহান ভারতীয় কবি তুলসীদাসের ৪০০তম জন্মোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এ বছর 'রামায়ণ'-এর অভিনয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সোভিয়েত অভিনেতা ও পরিচালক জেন্নাদি পেত্চনিকভ মস্কোয় তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস'-এর ৪০০ বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজনে সাহায্য নেবার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে দিল্লী এসেছিলেন।

"মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, ভাবধারায় আধুনিক—অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়; এর চেয়ে আধুনিক ভাবধারার কি আর কিছুই আছে—এই নাটক তাই অনিবার্যভাবেই বিপুল সংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করেছে।"[১৯]

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নস্থ প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাই যথার্থই বলেছেন, "আমাদের দু'দেশের মধ্যে নিয়ত বর্ধমান বন্ধুত্বের বন্ধনে এক স্বর্ণ যোগসূত্র" রচনা করেছে এই নাটকখানি।[২০] ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই নাটকখানির অভিনয়কে "দুই মহান দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ় করার কাজে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মীদের এক অসামান্য অবদান" ব'লে বর্ণনা করেছেন।[২১]

আজ রামায়ণ, তার আনুগত্য ও মৈত্রীর মহান আদর্শ, ন্যায়ের জয় সম্পর্কে তার আস্থা এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানীতে আগত অসংখ্য অতিথির উচ্চ প্রশংসা লাভ করছে। মস্কোয় মঞ্চস্থ এই নাটকখানি লাভ করেছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পাঁচখানি ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্রয়

অন্যান্য ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও চলতে থাকে। সোভ-এক্সপোর্ট ফিল্ম ১৯৭২ সালের ১৭ই মে বম্বেতে ভারতীয় চলচ্চিত্র রপ্তানি কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী গড়ে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মূল্যে পাঁচখানি চলচ্চিত্র ক্রয় করেছে। রাজকাপুরের 'মেরা নাম জোকার'ই মূল্য পেয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশনের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী মিঃ তারিক বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতি বছর কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকার ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্রয় করতে সম্মত হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় ৩০টি আঞ্চলিক ভাষায় আখ্যান ও সংলাপ দিয়ে সারা দেশে দেখানো হয়।

ভারত-সোভিয়েত যৌথ উদ্‌যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা

১৯৭৩ সালের ১৮ই জুলাই তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী শ্রী আই. কে. গুজরাল মস্কোয় এ পি এন-এর সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব "বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রে এক অনন্য ঘটনা এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলে দু'দেশের মধ্যে যৌথভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিনিময় হবে। এই সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং যৌথভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে।

মস্কোয় অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের

নেতৃত্ব করেন শ্রীগুজরাল। অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের চমৎকার আয়োজনের তিনি প্রশংসা করেন।[২২]

সাহিত্য

১৯৭০-৭২ এই দু'বছরে এশীয় ও আফ্রিকান সাহিত্যগ্রন্থের ৩০ লক্ষাধিক কপি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের ভারতীয় জাতীয় কমিটির প্রাক্তন সেক্রেটারি-জেনারেল সাজ্জাদ জহীর লিখেছেন, "এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের সংবাদ যে এগুলির মধ্যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কপিই ভারতীয় সাহিত্যের।"[২৩]

এ পি এন ও পি টি আই-এর মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্কে চুক্তি

১৯৭৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কোয় নোভোস্তি প্রেস এজেন্সী ও প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে এ পি এন-এর পক্ষে এ পি এন-এর বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান কে. খাচাতুরভ এবং প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার পক্ষে তার প্রধান সম্পাদক সি. রাঘবন স্বাক্ষর দেন।

এই চুক্তি অনুযায়ী এ পি এন পি টি আই-কে পি টি আই-এর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত এ পি এন-এর সংবাদাদি ভারতে গ্রহণ ও প্রকাশার্থ প্রচারের অধিকার দেয় এবং তার পরিবর্তে এ পি এন তার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত পি টি আই-এর সংবাদাদি সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রহণ ও প্রকাশের জন্য প্রচারের অধিকার পায়। দু'পক্ষই এই তথ্যে তার উৎস নির্দেশ ক'রে এবং তার বিষয়-বস্তু ও অর্থ বিকৃত না ক'রে ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী সম্পর্কে এ পি এন ও অন্যান্য সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের সংবাদাদি পাওয়া গেলে এ পি এন-এর বিবরণী যদি যথাসময়ে পৌঁছয় তাহলেও পি টি আই সেটিকেই অগ্রাধিকার দেবে। আবার ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের সংবাদ পাওয়া গেলে পি টি আই-এর বিবরণী যদি যথাসময়ে পৌঁছয় তাহলে এ পি এন সেটিকেই অগ্রাধিকার দেবে।

১। ইতিপূর্বের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে দেখুন জগদীশ বিভাকর-এর '25 ইয়ার্স অব ইন্দোসোভিয়েত ডিপ্লোমেটিক টাইজ' (নয়াদিল্লী, ১৯৭২), পৃঃ ৫; এবং কে. নীলকান্ত-এর 'পার্টনার্স ইন পিস' (নয়াদিল্লী, বিকাশ পাবলিকেশনস, ১৯৭২), পৃঃ ৭৮-৮৪।

২। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ; আরও দেখুন 'হিন্দু' (মাদ্রাজ), ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৩। ঐ।

৪। ন্যাশানাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৫। পেট্রিয়ট, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১.

৬। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (নয়াদিল্লী) কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন দেখুন। আরও অনুশীলনের জন্য দেখুন নীলকান্ত-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৫-৮৭।

৭। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

৮। হিন্দুস্থান টাইমস্ (নয়াদিল্লী), ২১শে জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ৫, স্তম্ভ ৫।

৯। ১৯৭২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের (নয়াদিল্লী) তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন, পৃষ্ঠা ১।

১০। ঐ।

১১। পেট্রিয়ট (নয়াদিল্লী), ১২ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১০, স্তম্ভ ১-২।

১২। দি ইভনিং নিউজ (নয়াদিল্লী), ৭ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ৭, স্তম্ভ ৪-৫।

১৩। ঐ

১৪। ঐ।

১৫। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের (নয়াদিল্লী) তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত প্রেস রিলিজ 'নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ ফ্রম দি সোভিয়েত ইউনিয়ন', ২৫শে জুলাই, ১৯৭৩, ভল্যুম ৩২, নং ১৭২, পৃঃ ৭।

১৬। ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্থান টাইমস্ (নয়াদিল্লী), ১৭ই জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ৪, স্তম্ভ ২-৩।

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ডঃ শর্মা নয়াদিল্লীতে ওল্ড সেক্রেটারিয়েটে কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ ইওরোপ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের তার সমাজতন্ত্র ও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রশংসা করেন। [স্টেটস্ম্যান্ (নয়াদিল্লী), ১৫ই অগস্ট, পৃঃ ১, স্তম্ভ-৪।]

১৭। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিক 'ইয়ুথ রিভিউ' (নয়াদিল্লী), ১৮ই অগস্ট, ১৯৭৩, ভল্যুম ১, নং ৩৩, পৃঃ ১।

১৮। ইভনিং নিউজ : হিন্দুস্থান টাইমস (নয়াদিল্লী), ৩১শে অগস্ট, ১৯৭৩, পৃঃ ৭, স্তম্ভ ১-৩।

১৯। আই. সেরেব্রায়াকভ : "রামায়ণ ইজ এ হিট অব সোভিয়েত স্টেজ", ইভনিং নিউজ (নয়াদিল্লী), ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ ৭, স্তম্ভ ১-২।

২০। আই. সেরেব্রায়াকভ কর্তৃক উদ্ধৃত মন্তব্য, ঐ, স্তম্ভ ২-৩।

২১। ঐ, স্তম্ভ ২-৩।

২২। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত প্রেস রিলিজ, 'নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ ফ্রম দি সোভিয়েত ইউনিয়ন', নয়াদিল্লী, ১৯শে জুলাই, ১৯৭৩, ভলুম ৩২, নং ১৬৭, পৃঃ ৬।

২৩। সাজ্জাদ জহীর-এর "ইণ্ডিয়া ইউ এস এস আর, ক্লোজার টুডে দ্যান এভার"—ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ কর্তৃক ২৯শে জুন, ১৯৭২, প্রচারিত বুলেটিন, পৃঃ ১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন নীলকান্ত-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৯-৮২। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের (নয়াদিল্লী) তথ্য বিভাগ কর্তৃক ৪ঠা অগস্ট, ১৯৭২, প্রচারিত বুলেটিও দেখুন, পৃঃ ১-৩।

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি যে সাথীত্বের সুদৃঢ় বন্ধন রচনায় সাফল্যের নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব সম্পর্কের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর থেকে সর্বক্ষেত্রেই ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তা এত বেশী হয়েছে যে ভারতীয়-দের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী জনপ্রিয় ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছে এবং এই জনপ্রিয়তার দিক থেকে তার ও দ্বিতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব পাবলিক ওপিনিয়ন' কর্তৃক গৃহীত জনমতে এই তথ্য প্রকাশ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ হচ্ছে যে সে ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে এবং বিশেষ ক'রে তার মৌল শিল্পের বিকাশে সাহায্য দিয়েছে। সর্বোপরি প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাথীর মত সে ভারতের সবচেয়ে বড় সংকটের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় মার্কিন সপ্তম নৌবহরের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য সোভিয়েত নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেছিল। চুক্তিটি এইভাবে ভারতের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবা-পন্ন যে-কোন দেশের প্রতি হুঁশিয়ারি হিসেবে কাজ করেছিল। তাছাড়া, গত সেপ্টেম্বর মাসে ঋণ হিসেবে গম দেওয়াটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এতে ভারতের জনসাধারণ এত খুশী হয়েছিল যে তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশস্তি স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দ্য কস্টার সংগৃহীত জনমতে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এতে এই মূল সত্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারতের জনসাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী বন্ধুভাবাপন্ন ব'লে মনে করে। তাই দুর্দিনে সোভিয়েতের বন্ধুত্বের পালটা পরিচয় দান ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ঘটনা হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। এর জন্যই এই উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিরতা বিধানের পক্ষে এক বিরাট নিশ্চয়তা মিলেছে। শুধু ভারতই নয়, এই মহাদেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষই এ থেকে বিরাট প্রেরণা পেয়েছে, তা যে-কোন অর্থেই বিচার করা হোক না কেন।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক—বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার পরিধি উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। চুক্তিটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে এইজন্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি হয়েছে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। শুধু একটি আন্তঃসরকার ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা কমিশনই গঠিত হয়নি, এটি গঠনের ফলে অনেকগুলি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিগুলি ভারতের কাছে, বিশেষভাবে তার মত একটি নতুন উন্নয়নশীল দেশের কাছে খুবই ফলপ্রদ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে কেন সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে তা সে কোনদিনেই গোপন করে নি। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করা যাতে তারা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক চাপ প্রতিহত করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের শত্রু ব'লে মনে করে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের স্বার্থেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শক্তিশালী ক'রে সাধারণ শত্রুকে দুর্বল ক'রে দিতে চায়। আসল কথা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রচেষ্টার অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে মস্কোর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থের মিল রয়েছে। এর ফলে ভারত তার রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রকে শক্তিশালী ক'রে এবং দারিদ্র্য ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে অনেকখানি স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে।

মাঝে মাঝে প্রকাশিত তথ্যাদিতে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার ব্যাপকতা প্রকাশ পায়। গত বছরগুলিতে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভাষ্যকারেরা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৩ সালে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন হয়েছিল, আর গত বছর তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৭০ কোটি টাকায়। আগামী দু'বছরে এই বাণিজ্যিক লেনদেন ৬০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে ব'লে অনুমান করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণই শুধু বাড়েনি, অর্থনৈতিক ভাষ্যকারেরা লক্ষ্য করেছেন যে বাণিজ্য-পণ্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। আশা করা যায়, ব্রেজনেভের সফরের ফলে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা সাংস্কৃতিক বন্ধন প্রসারের ক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ হয়েছে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে একটি শীর্ষস্থান দখল করেছে। উভয় দেশের জনগণের মধ্যে লেখাপড়া এবং পারস্পরিক সুবিধার্থ অর্থপূর্ণ সহযোগিতাই চুক্তিটিকে প্রকৃত স্থায়ী রূপ দিয়েছে। এই সহযোগিতা সবচেয়ে জোরদার হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে।

দু'দেশের জনগণ পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে উঠছেন, মানুষের জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন এবং প্রয়াসের দ্বারা মানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল দুর্গ-নির্মাণের সাধারণ সংগ্রামে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই অভিন্নতাই দু'দেশের জনগণের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের যুক্তিগত ভিত্তি রচনা করেছে। বিগত বহু বছর ধরে বিদ্বজ্জন, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ও ক্রীড়াবিদ্‌রা এই উদ্দেশ্যে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন।

এটাও উৎসাহোদ্দীপক ঘটনা যে উভয় পক্ষই পরস্পরের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ভারত সোভিয়েতের শান্তি ও মৈত্রীর নীতির প্রশংসা করেছে, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করেছে ও তাকে মর্যাদা দিয়েছে। ভারতের মতে জোট-নিরপেক্ষতা বলতে সমদূরত্ব বোঝায় না। এতে বোঝায় পারস্পরিকতা: এর অর্থ হচ্ছে, রুশরা যদি ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশী বন্ধু-ভাবাপন্ন হয় তাহলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বেশী বন্ধুভাবাপন্ন হবে।

এইসব ঘটনাবলী থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বার্থের অভিন্নতার এক বিশদ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে রয়েছে দৃষ্টি-ভঙ্গীর মিল। তাই এটা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় দিক্‌চিহ্ন।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় লেনিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। ভারতের জনগণের স্বাধীনতা ও অগ্রগতিতে লেনিনের ছিল গভীর আগ্রহ। বিশ্বে শান্তি ও প্রগতির সাধারণ সংগ্রামে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার স্বপ্নও দেখেছিলেন লেনিন।

আশা করা যায় ব্রেজনেভের সফরে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের স্বার্থে দু'দেশের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে যার জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

একযোগে আওয়াজ তুলেছে সেই আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এতে প্রশমিত হবে। বস্তুতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত কর্তৃক অনুসৃত শান্তিনীতির মধ্যে বিরাট মিল হয়েছে। মৈত্রীচুক্তির ঐতিহাসিক দলিলটি আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ককে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির জন্য দু'দেশের সরকার ও জনগণের একযোগে কাজ করার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে। আরও উৎসাহোদ্দীপক ঘটনা হচ্ছে, দু'দেশই নিয়মিতভাবে যে মঞ্চ পেয়েছে সেখানেই বহুরূপে প্রকাশিত উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম চলেছে তাতেও তারা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতিসাধনে সাহায্য করা তো দূরের কথা দুর্ভাগ্যবশতঃ চীন দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে তার তথাকথিত প্রভাবক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিবেশীদের ওপর সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সোভিয়েতের "সংশোধনবাদী নতুন জারদের" সহযোগিতা করছে ব'লে তারা যে অভিযোগ করেছে যে-কোন লোকই নিশ্চয় তা হেসে উড়িয়ে দেবে। "পুরনো কালের জারেরা যা পারেনি সেই বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন" এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে ব'লে চীন যে অভিযোগ করেছে তা তাদের নিজেদের সম্প্রসারণবাদী ও জাতিদম্ভগত অভিসন্ধির প্রেক্ষাপটে হাস্যকর ও আজগুবি ব'লে মনে হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের এই ধরনের অসময়োচিত বিষোদ্গার শুধু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে গভীর উদ্‌বেগের বিষয়ই নয়, এটা পশ্চিমী নয়া উপনিবেশবাদীদের হাতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই বিরোধ নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবার আর একটি সুযোগও এনে দেবে। মাত্র ক'দিন আগেও চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে তোলার বাসনা প্রকাশ করে, কিন্তু তার এই ধরনের নোংরা, জঘন্য ও কূটনীতিবিবর্জিত আচরণ সেই মনোভাবেরই সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যুগপৎ ভাবে বা মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়ে নরম ও গরম দু'রকমই বুলি ছেড়ে কোন দেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তাছাড়া, ব্রেজনেভের ভারত সফরের প্রাক্কালে চীন যে জঘন্য প্রচার চালায় তাতে চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া

ক্ষতিগ্রস্ত বা মন্দগতি হয়ে পড়বে এবং নিউইয়র্কে ভারতের পররাষ্ট্রসচীব ও চীনের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে সাম্প্রতিক বৈঠকে তার পরিচয়ও পাওয়া গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অতীতে বার বার বলেছে যে চীনের প্রতি সে শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে না, চীনের মত একটি বিশাল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সে ঘিরে ফেলতেও চায় না, চীনের সঙ্গে শান্তিতে ও সহযোগিতা ক'রে সে বাঁচতে চায়। কিন্তু ব্রেজনেভের ভারত সফরের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে চীন বৈরীসুলভ মনোভাব অবলম্বন করায় তার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাবও কঠোর হয়ে উঠবে।

পাকিস্তানী নেতারা স্পষ্টই বলেছেন যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কোন আগ্রহই তাঁদের নেই; তাঁরা না চাইলেও পাকিস্তানের জনগণ ভারতের ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে। এটা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও তাঁদের বিদেশী ধর্মপিতাদের যাঁরা ভারতকে দু'ভাগ করেছিলেন—পছন্দ নয়।

আমরা পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে পারি, পারি পাকিস্তান ও ইরান একজোট হলেও, কিন্তু এই দুই দেশে আমেরিকা ও চীনের আগ্রহ প্রকাশের ফলে এক নতুন অশুভ সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ধরনের ও এই আকারের সংঘাতে আমাদের সামরিক ও সম্পদের ওপর চাপ পড়বে। এবং শত্রুভাবাপন্ন দু'টি শিবির যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন সংঘর্ষের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এ থেকে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যাবে।

আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার নামে আমেরিকা ইরান ও অন্যান্য আরব দেশের মাধ্যমে পাকিস্তানকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছে। এতে ভারতীয়দের কাছে তার জনপ্রিয়তা যে ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য সে পরোয়াও করছে না। চীনের নেতৃত্ব এক অদ্ভুত ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিচ্ছে। ব্রিটেন ও আমেরিকা ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণের ও তাকে সংঘর্ষের এলাকায় পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রস্তাব দিয়েছে তা গভীরভাবে বিবেচনা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা দিয়েছে। এশিয়ার প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী অবশেষ এশীয় নিরাপত্তা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, কারণ এতে বাস্তবিকই সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সব অবশেষের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে। ভারত সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় অনুরূপ যে চুক্তি হয়েছে তা বাস্তবিকই আদর্শ-স্বরূপ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবশেষগুলিকে "এশিয়া ছাড়" ব'লে যাতে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া যায় তার জন্য সমগ্র এশিয়ায় এই আদর্শ অনুসরণের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পরিশিষ্ট

১

ভারত-সোভিয়েত যুক্ত ঘোষণা

১৯৭৩ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে প্রচারিত ভারত-সোভিয়েত যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হল :—

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭৩ সালের ২৬ থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে সরকারীভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সফর করেন।

লিওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এ. এ. গ্রোমিকো, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক মিঃ ডি. এ. দীনমুহম্মদ কুনায়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের উপ-সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি মিঃ এন. কে. বাইবাকভ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি মিঃ এস. এ. স্কাচকভ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল. আই. ব্রেজনেভ ও তাঁর সঙ্গীদের সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এ থেকে সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের প্রতি ভারতীয় জনগণের আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার মনোভাবের প্রমাণ মেলে। ভারতে মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভের সফর সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্ববন্ধন শক্তিশালী হবার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল. আই. ব্রেজনেভ ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ

সম্পাদক মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার আদর্শে এবং বিশ্বশান্তি সুদৃঢ় করার আদর্শে শ্রীমতী গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিগত অবদানের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে সোভিয়েত নেতৃত্বের ও সমগ্র সোভিয়েত জাতির অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে বিরাট শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারতে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে ব'লে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দিল্লীতে অবস্থানকালে মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ রাজঘাট, শান্তিবন ও বিজয়ঘাটে পুষ্পমাল্য অর্পণ ক'রে ভারতের মহান সন্তান মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ লালকেল্লায় একটি মৈত্রীসভায় ভাষণ দেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিরাট উৎসাহ ও উষ্ণ আবেগ সহকারে তাঁকে স্বাগত জানান। মিঃ ব্রেজনেভ ভারতীয় সংসদ সদস্যদেরও কাছে ভাষণ দেন, তাঁরা গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তাঁর ভাষণ শ্রবণ করেন। ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গেও তিনি মিলিত হন। উষ্ণ আবেগ ও আন্তরিকতার আবহাওয়ায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দিল্লীতে অবস্থানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মি ব্রেজনেভের কতকগুলি বৈঠক ও আলোচনা হয়।

এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন:

ভারতের পক্ষে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং, অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন, পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. ধর, পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র-পাল সিং, পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শ্রীকেবল সিং, প্রধানমন্ত্রীর সচিব শ্রী পি. এন. ধর, সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ডঃ কে. এস. শেলভাঙ্কার, পররাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী বি. কে. সান্যাল এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী এ. পি. ভেঙ্কটেশ্বরম।

সোভিয়েত পক্ষে: সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আন্দ্রেই গ্রোমিকো, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক মিঃ ডি. এ. কুনায়েভ সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের উপ-সভাপতি ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ব্যুরোর সভাপতি মিঃ এন. কে. বাইবাকভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি মিঃ এস. এ. স্কাচকভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সহকারী মিঃ এ. এম. আলেকজান্দ্রভ এবং ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়নের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ভি. কে. বলদিরেভ।

আস্থার আবহাওয়া

আস্থা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত আলোচনার সময় ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক ও তার অধিকতর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন নিয়ে এবং পরস্পরের আগ্রহ আছে এমন প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সমস্যাদি নিয়ে মত বিনিময় হয়। উভয়পক্ষই সন্তোষ সহকারে লক্ষ্য করেন যে আলোচিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি মতের মিল রয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার সফল বিকাশে উভয়পক্ষ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আর্থব্যবস্থার বিকাশ সম্বন্ধে, সোভিয়েত জনগণের জীবন সম্বন্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে উপস্থাপিত শান্তির কর্মসূচী অনুসারে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অবহিত করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক শান্তি সুসংহত করা, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা সুদৃঢ় করা এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিগুলিকে সমর্থন দান ও তাদের দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক ভাবে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির উচ্চ মূল্যায়ন করেন।

ভারতের নীতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রীও আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদককে জোট-নিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূলনীতিভিত্তিক ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে এবং ভারতের আর্থব্যবস্থার বিকাশ ও ভারতীয় জনগণের জীবন উন্নত করার

লক্ষ্যাভিমুখী সরকারের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অবহিত করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ধারাবাহিক ভাবে অনুসৃত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির, তার জোট-নিরপেক্ষতার নীতির এবং শান্তির পক্ষে এবং উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার বিরাট অবদানের—যা যথার্থভাবেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের মর্যাদা এনে দিয়েছে—উচ্চ প্রশংসা করেন।

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি

আলোচনাকালে দুই পক্ষই ১৯৭১ সালের অগস্ট মাসে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির অসাধারণ গুরুত্বের উপর জোর দেন। এই চুক্তি দুই দেশের চিরাচরিত বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করার ব্যাপারে এক নতুন স্তর সূচিত করেছে। এই চুক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক-কারিগরী, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার অধিকতর সম্প্রসারণের উপর ক্রমবর্ধমান সদর্থক প্রভাব বিস্তার করছে। এশিয়ায় ও পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করার ব্যাপারে এই চুক্তি হয়ে উঠেছে অন্যতম বৃহৎ অবদান।

উভয় পক্ষই দুই দেশের জাতিগুলির মূল্যবান সম্পদস্বরূপ ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সর্বতোভাবে বিকশিত করতে দুই দেশের দৃঢ় সংকল্পের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে পুনরায় ঘোষণা করেন।

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সমস্যাদি নিয়ে মত বিনিময়ের সময় উভয় পক্ষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থানের মিল কিংবা নৈকট্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোর দিয়ে বলেন যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত প্রশ্নাদির মীমাংসার জন্য অধিকাংশ রাষ্ট্রের কামনা আজকের পৃথিবীতে ক্রমেই অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠছে। সাধারণ বিশ্ব পরিস্থিতির উন্নতিতে সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ আলোচনার গুরুত্ব-পূর্ণ অবদানের সদর্থক মূল্যায়ন ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে এই আলোচনা চলাকালে যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলি শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা বিকশিত করার এবং আন্তর্জাতিক বাতাবরণ উন্নত করার অভীষ্টের সহায়ক হবে। পারমাণবিক যুদ্ধ নিবারণ সম্পর্কে সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তি সম্পাদনের

প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে। এই চুক্তি শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থ সিদ্ধ করছে তা নয়, পরন্তু সর্বজনীন শান্তি সুদৃঢ় করার অভীষ্ট সিদ্ধিরও সহায়ক হচ্ছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনকে বিশ্ব-উত্তেজনা প্রমশনের দিকে একটি পদক্ষেপ ব'লে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রচেষ্টার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই উত্তেজনা-প্রশমন পৃথিবীর অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়বে এবং যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা মনুষ্যজাতির বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে তার অবসান ঘটাবে।

উভয়পক্ষই ইওরোপে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানান। নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত ইওরোপীয় সম্মেলনের কাজ হ'ল উত্তেজনা প্রশমনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এবং ইওরোপ মহাদেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দৃঢ় বনিয়াদ রচনা করা। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত নিখিল ইওরোপীয় সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘটবে।

একই সময়ে, তাঁরা লক্ষ্য করেন যে পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে উত্তেজনার উর্বর ক্ষেত্র এখনো রয়ে গেছে, এবং তাঁরা উপনিবেশবাদের অবশেষ, নয়া উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও কোণঠাসা করার নীতির অবসান ঘটানোর জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয় পক্ষ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সবগুলি সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। এখনো বিদ্যমান যুদ্ধের যেসব উর্বর ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, বিশ্বশান্তি ও জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাপ্রদ সহযোগিতাকে বিপন্ন করছে সেগুলি নির্মূল করার জন্য দুই রাষ্ট্রই চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না ব'লে তাঁরা আরও ঘোষণা করেন।

ভিয়েতনাম

উভয় পক্ষই বিশ্বাস করেন, উত্তেজনা প্রশমন ছোট বড়, উন্নত ও উন্নয়নশীল —পৃথিবীর সব দেশেরই প্রকৃত বাস্তব কল্যাণ আনয়নে সমর্থ এবং তা অবশ্যই আনবে।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়ার পরিস্থিতিতে সদর্থক পরিবর্তন-গুলিতে স্বাগত জানায়।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে যে ১৯৭৩ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখের ভিয়েতনামে যুদ্ধাবসান ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তির ভিত্তিতে ভিয়েতনামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং লাওসে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐকমত্য অর্জন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন এশিয়ায় ও সারা পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি এবং অন্যান্য অমীমাংসিত আন্তর্জাতিক সমস্যাদি মীমাংসার অবস্থা সৃষ্টি করছে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছে যে সংশ্লিষ্ট সবগুলি পক্ষ কর্তৃক উপরে বর্ণিত চুক্তিগুলি অবিচল ভাবে ও পুরোপুরি রূপায়িত করা এবং কাম্বোডিয়ার জনগণের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী কাম্বোডিয়া সমস্যার আশু ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা হোক।

দুই পক্ষই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যোগাযোগকে স্বাগত জানান এবং মনে করেন যে কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তেজনা হ্রাস এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ভারতীয় উপমহাদেশ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি সম্বন্ধে মত বিনিময় করেছেন। যে একাধিক সমস্যা ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণে বাধা সৃষ্টি করছিল সেগুলি মীমাংসার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এই এলাকায় সাম্প্রতিক সংকটের পরিণাম পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার পক্ষে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উভয় পক্ষই মনে করেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো বিদ্যমান বিতর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে, এগুলির সমাধান করতেই হবে, বাইরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুসারে এইসব সমস্যার মীমাংসা এই এলাকার সবগুলি দেশের সবগুলি জাতির স্বার্থানুসারী হবে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে যে ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা ও ১৯৭৩ সালের ২৮শে অগস্ট তারিখের ভারত-পাকিস্তান চুক্তি উপমহাদেশে পরিস্থিতির পূর্ণ স্বাভাবিকীকরণ অভিমুখে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নিজ আর্থব্যবস্থা সুদৃঢ় করার এবং বাংলাদেশের জনগণের সামনের জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করার ব্যাপারে জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ যে সাফল্য অর্জন করেছে দুই পক্ষই সন্তোষের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভারত ও

সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণের দাবি করছে এবং তাঁরা মনে করেন যে এই আন্তর্জাতিক সংঠনের সদস্যপদ পাবার এর ন্যায্য অধিকারের বাস্তবায়নে বিলম্ব করার কোনই কারণ নেই।

দুই পক্ষ মনে করেন যে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে তা হবে উপমহাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জনের এবং সুদৃঢ় স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার স্বার্থানুসারী। তাঁরা এই আশা প্রকাশ করেন যে পাকিস্তানের দিক থেকে অদূর ভবিষ্যতে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পশ্চিম এশিয়া

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। সেখানে ইসরায়েল কর্তৃক আরব ভূখণ্ড অব্যাহতভাবে দখল ক'রে রাখার ফলে সম্প্রতি নতুন ক'রে যুদ্ধ বেধে গেছে। ১৯৭৩ সালের ২২শে অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ৩৩৮নং প্রস্তাবে দু'পক্ষই স্বাগত জানান এবং এটা লক্ষ্য করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘর্ষের রাজনৈতিক মীমাংসায় একটি ভিত্তির দিকে—১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর গৃহীত ২৪২নং প্রস্তাব অবিলম্বে রূপায়ণের দিকে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। ইসরায়েল কর্তৃক দখলীকৃত আরবভূমির পূর্ণ মুক্তি ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের বৈধ অধিকার সুনিশ্চিত করা ব্যতীত এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অচিন্তনীয়। দখলীকৃত আরব এলাকা ইসরায়েল যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি তত তাড়াতাড়ি সুনিশ্চিত হবে। পক্ষদ্বয় এই বিষয়ে একমত হন যে একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ কঠোরভাবে রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই এই এলাকায় স্থায়ী শান্তি আসতে পারে। এটাই হবে সেই এলাকার দেশ ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার ও অধিকারগুলি মান্য ক'রে চলার পক্ষে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি। পক্ষদ্বয় আবার রাষ্ট্রসমূহ ও জাতিগুলির ন্যায়সঙ্গত আদর্শকে সর্বাত্মক সহায়তা দানের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন।

এশিয়া

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পুনরায় ঘোষণা করে যে তারা বিশ্বের এই সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এশিয়ায় পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার ব্যাপক বিকাশ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা সংহত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

একমত যে অবস্থায় জাতিসমূহ শান্তিতে ও প্রতিবেশীর মত বসবাস করতে পারে এবং জাতিসমূহের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং তার আর্থব্যবস্থা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে তাদের জনশক্তি ও বৈষয়িক সম্পদ পরিচালিত করা যায়।

বলপ্রয়োগ পরিহার, সার্বভৌমত্বকে মান্য করা, সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যাপক বিকাশের নীতিসমূহই সকল রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত ব'লে পক্ষদ্বয় বিশ্বাস করেন।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসমূহের নিজের ভবিতব্য নিজে স্থির করার, তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করার এবং প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধন করার অধিকারের অবিচল সমর্থক।

রাষ্ট্রসংঘ

রাষ্ট্রসংঘের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ ক'রে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে তার সদর্থক অবদানকে স্বীকার ক'রে পক্ষদ্বয় রাষ্ট্রসংঘকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করার ও রাষ্ট্রসংঘ সনদের লক্ষ্য ও মূলনীতিসমূহ কঠোরভাবে মেনে চলার ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তা রক্ষায় তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করে যে কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অবসান, পারমাণবিক ও চিরপ্রচলিত—এই উভয় ধরনের অস্ত্র সহ সর্বাত্মক ও সামূহিক নিরস্ত্রীকরণ অর্জন শান্তিকে রক্ষা ও সংহত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একটি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য বাস্তব প্রস্তুতি চালানোর সময় এসে গিয়েছে, এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ কমিটির কাজে সমর্থন জানাতে তাঁরা প্রস্তুত ব'লে ঘোষণা করেন।

ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার প্রশ্নটির সমাধান সন্ধান করার জন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে অংশগ্রহণ করায় তারা যে প্রস্তুত একথা পক্ষদ্বয় পুনরায় ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনা হিসাবে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক একটি প্রস্তাব গ্রহণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য

করে। সেই প্রস্তাবে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসংঘ সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা সব ধরনের রূপ ও প্রকাশ সহ বলপ্রয়োগের হুমাক পরিহার করার এবং যুগপৎ চিরদিনের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আন্তরিক সংকল্প করেছেন। পক্ষদ্বয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই সিদ্ধান্তের রূপায়ণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ও তা সকল রাষ্ট্রের স্বার্থসম্মত হবে। রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ-পরিষদের এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের মারফত বাস্তবসম্মতভাবে রূপায়ণ সুনিশ্চিত করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তাঁরা জানান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সামরিক বাজেট হ্রাস করার যে প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে স্বাগত জানান এবং এইভাবে যে অর্থ বাঁচবে তার একটা অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে দেওয়ার ভারতের বিশ্বাসের কথা তিনি আরেকবার প্রকাশ করেন। উভয়পক্ষই এ বিষয়ে একমত হন যে নিরস্ত্রীকরণের স্বার্থে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে সাহায্য বৃদ্ধি করার জন্যও কিভাবে এই প্রস্তাবকে কাজে লাগানো যেতে পারে তা স্থির করার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

উপনিবেশবাদ

দ্রুততম উপায়ে উপনিবেশবাদের অবশেষসমূহ সম্পূর্ণ দূরীকরণের জন্য, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জাতিসমূহকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণাকে দ্রুত ও কার্যকর ভাবে রূপায়ণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত দৃঢ়ভাবে দাবি ক'রে যাবে। যেখানেই থাকুক জাতিবৈষম্য ও জাতিবিদ্বেষের সকল রূপ ও প্রকাশকে উভয়পক্ষই দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা করেন।

ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক

আলোচনাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এই বিষয়ে তাঁদের গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর বহুমুখী ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক অবিচলভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁরা একথা আন্তরিকভাবে পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই দেশের মধ্যে যে সহযোগিতা বিকাশ লাভ করেছে তাকে জোরদার ও সম্প্রসারিত করার কর্মধারা নিয়মিতভাবে অনুসরণ ক'রে চলবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুই রাষ্ট্রের সমঝোতা ও পারস্পরিক আস্থার জন্য, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নগুলির সফল মীমাংসার জন্য এবং বিশ্বশান্তিকে জোরদার করার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য শীর্ষ পর্যায় সমেত সমস্ত পর্যায়ে রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সংযোগের প্রভূত গুরুত্বের উপর জোর দেন।

উভয় পক্ষই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক অর্থনৈতিক, বানিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সফল বিকাশের উচ্চ মূল্যায়ন করেন।

দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতার দরুন ভারতে অনেকগুলি প্রধান শিল্প উদ্‌যোগ ও প্রকল্প নির্মিত হয়েছে কিংবা নির্মাণ করা হচ্ছে। যেমন, ভিলাই ও বোকারোর ধাতুশিল্প কারখানা, রাঁচী, হরিদ্বার ও দুর্গাপুরের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, বারাউনি ও কয়ালির তৈল শোধনাগার, তৈল ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশন ও অন্যান্য প্রকল্প। এগুলি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার জন্য ভারত সরকারের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—পরিপূরক।

উভয় পক্ষই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিকশিত ও তা শক্তিশালী করার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করেন। সোভিয়েত সহায়তায় পূর্বে নির্মিত কতকগুলি প্রকল্পকে সম্প্রসারিত ক'রে এবং লৌহ ও লৌহেতর ধাতুবিদ্যা, ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন ও শোধন, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, পেট্রোরসায়ন ও অন্যান্য শিল্পশাখা সমেত নতুন শিল্প উদ্‌যোগ ও প্রকল্প নির্মাণ ক'রে এবং কৃষিব্যবস্থায় ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় প্রযুক্তিবিজ্ঞান কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা চালানো হবে। এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে ভিলাইয়ের ধাতু কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ৭০ লক্ষ টনে এবং বোকারোর ধাতু কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি টনে সম্প্রসারিত করা, বার্ষিক ৬০ লক্ষ টন তৈল উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি তৈল শোধনাগার মথুরায় নির্মাণ, মালানজখন্দে একটি তাম্রখনি ও ড্রেসিং সমাহার নির্মাণ, কলকাতার ভূ-গর্ভস্থ মেট্রোপলিটন রেলপথ নির্মাণ, এবং পক্ষদ্বয় পরে যেভাবে স্থির করিবেন সেইভাবে অন্যান্য প্রকল্প নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে লৌহেতর ধাতু, হালকা ও অন্যান্য

শিল্পে উৎপাদন-সহযোগিতা বিকশিত করার ব্যাপারে পক্ষদ্বয় বিশেষভাবে সহযোগিতা করবেন।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকার প্রয়োজন অনুসারে ভারত সরকারকে যথোচিত অর্থনৈতিক সাহায্য দেবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল. আই. ব্রেজনেভের ভারত সফরের সময় নিম্নলিখিত চুক্তি-গুলি স্বাক্ষরিত হয়:

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার আরো বিকাশ সম্পর্কে একটি চুক্তি ও এই চুক্তি রূপায়ণের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে একটি প্রটোকল।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পরিকল্পনা কমিশন ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্কে একটি চুক্তি।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকার ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সরকারের মধ্যে বাণিজ্য দূতস্থান সম্পর্কিত একটি চুক্তি।

উভয় পক্ষই বিশ্বাস করেন যে এই সমস্ত চুক্তি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী ও সার্বিক সহযোগিতাকে আরো শক্তিশালী করার ব্যাপারে হবে এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

উভয় পক্ষই এটা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশলাভ করছে। সমানাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধার মূলনীতির ভিত্তিতে ফলপ্রদ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এই দুই বন্ধু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশে হয়ে উঠেছে এক বিষয়গত নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সহযোগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়ে পক্ষদ্বয় ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের পরিমাণ দেড় থেকে দুই গুণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে পক্ষদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি ১৯৭৪ সালে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ভিত্তির উপর ও বিরাট পরিসরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আরো বিকাশের জন্য প্রস্তাবসমূহ রচনা করবেন। বিশেষীকরণ ও পৃথক পৃথক শিল্পপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে উৎপাদন সহযোগিতা, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজনমত পরস্পরকে মাল যোগানো বৃদ্ধি করার জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন শিল্প

নির্যোগ নির্মাণ ও বিদ্যমান উদ্‌যোগগুলির সম্প্রসারণকে হিসাবে রেখে এই প্রস্তাবসমূহে পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার নতুন ধরনের ব্যবস্থা থাকবে।

বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সংবাদ, রেডিও, টেলি-ভিশন, চলচ্চিত্র, পর্যটন ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কবন্ধনকে উভয়পক্ষই স্বাগত জানান। এইসব ক্ষেত্রে যে যোগসূত্রগুলি রয়েছে তাকে আরো নিখুঁত ও নিবিড় করার কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ব'লে তাঁরা মনে করেন।

পক্ষদ্বয় এই আস্থা প্রকাশ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল. আই ব্রেজনেভের সফর এবং সফরকালে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা সোভিয়েত ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও ফলপ্রদ সহযোগিতার আরো বিকাশের ক্ষেত্রে এবং এশিয়ায় ও বিশ্বজুড়ে শান্তি জোরদার করার ক্ষেত্রে এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সূচিত করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল. আই. ব্রেজনেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারীভাবে মৈত্রী সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়।

	এল. আই. ব্রেজনেভ
ইন্দিরা গান্ধী	সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির
ভারতের প্রধানমন্ত্রী	কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

নয়াদিল্লী

২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৩

ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী)-এ প্রকাশিত পূর্ণ বিবরণ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ ৪, স্তম্ভ ২-৮]

(২)

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি

১৯৭৩ সালের ২৯শে নভেম্বর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার আরও বিকাশ সম্পর্কে স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকার ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সরকার ১৯৭১ সালের ৯ই অগস্ট তারিখের ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী ও বিকশিত করতে ইচ্ছুক হয়ে,

ভারতের আর্থব্যবস্থার বহু শাখায় দুটি দেশের মধ্যে ব্যাপক পরিসরে সহযোগিতার ফলে ভিলাই ও বোকারোতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, রাঁচী হরিদ্বার ও দুর্গাপুরে মেসিন নির্মাণ কারখানা, বারাউনি ও কয়ালিতে তৈল শোধানাগার, তৈল উৎপাদন প্রকল্প, বিদ্যুৎ স্টেশন ও অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় একাধিক বৃহৎ শিল্প সংস্থা ও প্রকল্প স্থাপিত হচ্ছে এবং এগুলি ভারত সরকারের নিজ আর্থব্যবস্থা বিকশিত করার ও ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—একথা স্মরণ করে,

দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণপ্রদ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহ-যোগিতা সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে প্রসারিত ও গভীরতর করার জন্য তাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা থেকে অগ্রসর হয়ে এবং এরূপ সহযোগিতা হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে উভয়ই দেশের জনগণের স্বার্থানুসারী—এ সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় হয়ে,

এই চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত হয়েছে। এই চুক্তির সংস্থানগুলি নিম্নরূপ :

১নং ধারা : এই চুক্তির পক্ষদ্বয় সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ, সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকারের মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং বাণিজ্য আরও বিকশিত ও শক্তিশালী ক'রে চলবে। এরূপ সহযোগিতা রূপায়িত ও শক্তিশালী করা হবে শ্রমশিল্প, বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি, ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কর্মী-দলের প্রশিক্ষণ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এবং দুই দেশের আর্থব্যবস্থার জন্য যেসব শাখায় প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পূর্বাবস্থা দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে অনুকূল।

২নং ধারা : এর ১নং ধারায় বর্ণিত সহযোগিতার লক্ষ্য হবে পরস্পরের অনুকূল শর্তে উৎপাদনে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এবং সর্বাধুনিক কারিগরী ও প্রযুক্তিগত কৃতিত্বগুলির ভাগ নেবার ও সেগুলি কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে দুটি দেশের আর্থব্যবস্থা বিকশিত করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান ক'রে দেখা। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে :

(i) লৌহ ও ইস্পাত এবং লৌহেতর ধাতু উৎপাদন, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজের সন্ধান, উৎপাদন ও পরিশোধন, বিদ্যুৎ এঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প, জাহাজ চলাচল ও শ্রমশিল্পের অন্যান্য শাখা ও কৃষির ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পগুলির নক্শা রচনা ও নির্মাণে, এবং কর্মী-দলের প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ বিধানে সহযোগিতা কার্যকর করা হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে পূর্বে যেসব প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রসারিত ক'রে, শ্রমশিল্প, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপন ক'রে এবং বিশেষীকৃত প্রশিক্ষণের জন্য ইনষ্টিট্যুট স্থাপনে সাহায্য ক'রে। ভিলাই ও বোকারো লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ৭০ লক্ষ ও ১ কোটি টনে উন্নীত করার জন্য সেগুলির আরও সম্প্রসারণে, বছরে ৬০ লক্ষ টন তৈল উৎপাদনক্ষম মথুরা তৈল শোধানাগার নির্মাণে, মালাজখন্দে তাম্রখনি সমাহার, কলকাতা পাতাল রেল প্রকল্প এবং দুইপক্ষ অন্য যেসব প্রকল্প সম্বন্ধে একমত হবেন সেগুলি নির্মাণে. এবং লৌহেতর ধাতু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও হাল্কা শিল্পে এবং শিল্পের অন্যান্য শাখায় উৎপাদন সহযোগিতার বিকাশে দুইপক্ষ সহযোগিতা করবেন।

(ii) উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকারকে ঋণ দেবেন। এই ঋণের পরিমাণ এবং শর্তাদি পৃথক চুক্তি অনুসারে স্থির করা হবে।

(iii) সম্পূর্ণ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের যোগান বাড়িয়ে, পরস্পরের আগ্রহ আছে এমন পণ্যাদির বৈচিত্র্য, ও পরিমাণ সম্প্রসারিত করে পণ্য লেনদেনের অবিচল বিকাশকে আরও এগিয়ে নেওয়া হবে।

(iv) হিসাব এবং ঋণ সম্পর্কের শর্তাদির পারস্পরিক মীমাংসার পদ্ধতি জটিলতামুক্ত ও উন্নত করা হবে।

(v) তৃতীয় দেশগুলিতে কারখানা স্থাপনের জন্য সাজসরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ যোগানের ব্যাপারে দুই পক্ষ সহযোগিতা করবেন।

৩নং ধারা : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পারমানবিক শক্তি, মহাকাশ ও ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্র সমেত দুই দেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রগতিতে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশে অবদান যোগাচ্ছে তার প্রতি বিরাট গুরুত্ব আরোপ ক'রে দুই পক্ষই এই সহযোগিতা আরও বিকশিত ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন ব'লে মনে করেন।

৪নং ধারা : এই চুক্তির পক্ষদ্বয় সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে তুলবেন, এবং এর ভিত্তিতে, পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ও দুটি দেশের প্রত্যেকটিতে বলবৎ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ও কন্‌ট্রাক্ট সম্পাদনের পথ সুগম করবেন।

৫নং ধারা : অপর দেশের বাজারে এক দেশের রপ্তানির প্রবর্ধন ভবিষ্যতেও তাদের কামনা থাকছে, এটি লক্ষ্য ক'রে এই চুক্তির পক্ষদ্বয়, তাদের আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তাদের মধ্যে বলবৎ চুক্তি ও সন্ধিসমূহ-মেনে চ'লে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধা, বিশেষ অধিকার, সুযোগ ও অনুকূল শর্ত মঞ্জুর করবেন।

৬নং ধারা : এই চুক্তির পক্ষদয় দুই দেশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়ে পরস্পরের স্বার্থ ও আগ্রহ আছে এমন সব ব্যাপার সম্বন্ধে নিয়মিত পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

৭নং ধারা : এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার দিন থেকে বলবৎ হবে। বর্তমান চুক্তিটি পনর বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হচ্ছে। এরপর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার ছয় মাস আগে কোন এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে চুক্তি খারিজ করার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত না করে তাহলে এই চুক্তির মেয়াদ আপনা থেকেই পরবর্তী প্রতি পাঁচ বছর ক'রে বেড়ে যাবে।

নয়াদিল্লীতে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৩-এ হিন্দী, রুশ ও ইংরেজী ভাষার প্রতিটিতে দুটি ক'রে মূল কপিতে স্বাক্ষরদান করা হল। চুক্তির প্রতিটি পাঠই সমান প্রামাণ্য।

ভারত প্রজাতন্ত্রের সরকারের পক্ষে	সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সরকারের পক্ষে
ইন্দিরা গান্ধী	এল. আই. ব্রেজনেভ

[ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪, স্তম্ভ ৪-৭]

৩

পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে চুক্তি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পরিকল্পনা কমিশন এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির (সোভিয়েত ইউনিয়নের গসপ্ল্যান) মধ্যে সহযোগিতা সম্বন্ধে স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

অর্থব্যবস্থার পরিকল্পিত বিবরণের গুরুত্বের মর্ম উপলব্ধি ক'রে এবং অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ক আন্তঃসরকারী ভারত-সোভিয়েত কমিশন স্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের মধ্যেকার চুক্তির ৬নং ধারা দ্বারা চালিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হয়েছেন :

১। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ক আন্তঃ-সরকারী ভারত-সোভিয়েত কমিশনের কাঠামোর অভ্যন্তরে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্বন্ধে একটি যুক্ত ভারত-সোভিয়েত সমীক্ষক দল স্থাপিত হবে।

২। (i) ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির (সোভিয়েত ইউনিয়নের গসপ্ল্যান) দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সমীক্ষক দল গঠিত হবে। ভারত সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ প্রয়োজন মনে করবেন সেইভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহের কিংবা রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিরা এঁদের সাহায্য করবেন।

(ii) পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদেরও উপদেষ্টা এবং/কিংবা বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজে লাগানো যাবে।

৩। (i) সমীক্ষদলের প্রধান কাজ হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় :

(ক) অর্থনৈতিক পূর্বাভাসদান,

(খ) বার্ষিক, মাঝারি ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার পদ্ধতিবিদ্যা,

(গ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী সূত্রায়ন,

(ঘ) পরিকল্পিত কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখার ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতি,

(ঙ) উপকরণ সরবরাহের পরিকল্পনা,

(চ) প্রকাশিত রিপোর্ট, মাল-মসলা ইত্যাদি বিনিময় ;

(i) সমীক্ষকদল যেসব সমস্যার পর্যালোচনা করবেন সেগুলির পরিসর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

(ii) প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্তঃসরকারী কমিশন অন্য যে-কোন বিষয় পাঠালে সমীক্ষক দল তাও বিচার-বিবেচনা করবেন ও সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবেন।

৪। সমীক্ষক দলের সভা সাধারণত নয়াদিল্লী ও মস্কোতে পালা ক'রে বছরে অন্যূন একবার অনুষ্ঠিত হবে।

৫। (i) সমীক্ষক দলের ভারতীয় ও সোভিয়েত পক্ষের নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে প্রতিটি সভার আলোচ্যসূচী ও সময়সীমা নির্ধারণ করবেন ;

(ii) সমীক্ষক দলের আলোচনা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য উভয় পক্ষ প্রতিটি সভার আগে মাল-মশলা ও দলিলপত্র প্রচার করবেন।

৬। (i) সমীক্ষকদলের প্রতিটি সভার শেষে আলোচনার ফলাফল প্রতিফলিত করে সর্বসম্মত আলোচনার বিবরণ রচনা করা হবে ;

(ii) সর্বসম্মত আলোচনার বিবরণ প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্তঃসরকারী কমিশনের কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে।

নয়াদিল্লীতে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৩-এ হিন্দী, রুশ ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিটিতে দুইটি ক'রে মূল কপিতে স্বাক্ষর দান করা হল। চুক্তির সবগুলি পাঠই সমান প্রামাণ্য।

ডি. পি. ধর
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকারের
পরিকল্পনা মন্ত্রী

এন. কে. বাইবাকভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা
কমিটির সভাপতি

[ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ ৪, স্তম্ভ ৫-৬]

৪

ভারতীয় সংসদে ব্রেজনেভের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষ

শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি, শ্রদ্ধেয়া প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতি, স্পীকার মহোদয় ও সংসদের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

সর্বাগ্রে আপনাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংসদে ভাষণ দেবার সম্মান দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে সংসদ যে বিরাট ভূমিকা পালন করে সে সম্বন্ধে আমি ভালভাবে অবহিত আছি।

এই সুযোগ গ্রহণ করে আমি আমার সহকর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যদের, সোভিয়েত সংসদের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাই।

বন্ধুগণ,

আপনাদের প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহৃদয় আমন্ত্রণে আমরা আপনাদের দেশে এসেছি। আমরা আপনাদের জানাতে চাই এই আমন্ত্রণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করার প্রতি, তার সঙ্গে সম্পর্কের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাবার প্রতি বিরাট তাৎপর্য আরোপ করে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এক বড় ভূমিকা পালন করছে। যুদ্ধ বা বিরোধের কৃষ্ণচ্ছায়া কখনো সম্পর্ককে ব্যাহত করে নি। আমাদের জাতিগুলির পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার মনোভাব সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের সমগ্র ইতিহাস ধরে বেড়েছে ও শক্তিশালী হয়েছে।

সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই ভারতীয় জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে থেকেছেন, একে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন, এর সাফল্যে উল্লসিত হয়েছেন। অতীতে এই শতকের ঊষাকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন ভারতে উপনিবেশবাদীদের স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ভারতীয় জনগণের প্রাণশক্তির উপর তাঁর ছিল গভীর আস্থা, তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্য পতনের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

আমরা জানি, ভারতীয় জনগণ ও তাঁদের প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ আমাদের বিপ্লব সম্বন্ধে, সোভিয়েত ভূমিতে এক নতুন সমাজ নির্মাণ সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহী হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন যে মহামতি লেনিনের অনুজ্ঞা পালন ক'রে রাশিয়া ভবিষ্যতের পানে নেত্রপাত করেছে।

গত কয়েক দশকে আমাদের দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের সফল বিকাশের ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার এই মনোভাবের আরও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

আমাদের দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রগাঢ় শান্তিকামী প্রকৃতিও উভয় দেশকে নিকটতর করার কারণ। আজকে সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্বের শক্তিবৃদ্ধি দুই দেশের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এই গ্রহ জুড়ে শান্তির সংহতি-সাধন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ-তাৎপর্য পরিগ্রহ করছে।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ,

অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের সামনে বক্তৃতা দেবার সময় স্পষ্টতই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির সবগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমীক্ষা উপস্থিত করার দরকার পড়ে না। আপনারা ভাল ক'রেই সেগুলি জানেন; আপনারা অবশ্যই জানেন যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে এমন এক আমূল উন্নতির প্রবর্ধনের জন্য কাজ করাকে আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি যা শান্তির দৃঢ় গ্যারান্টি সৃষ্টি করা, প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুরক্ষিত করা, উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপক বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর ক'রে তুলবে। ঠিক এটিই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে প্রণীত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচীই আমাদের রাষ্ট্রের বৈদেশিক রাজনৈতিক কর্মপন্থা হয়ে উঠেছে।

এ সব কর্তব্য সম্পাদনের, শান্তির কর্মসূচী রূপায়নের উপর কেন আমরা এত বিরাট গুরুত্ব আরোপ করি?

একথা স্পষ্ট যে এক নতুন সমাজ নির্মাণের বিরাট পারকল্পনা কার্যকর করার জন্য সোভিয়েত জনগণের দরকার শান্তি, প্রশান্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধাপ্রদ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী যোগাযোগের প্রসার। অন্যান্য জাতির, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সবগুলি জাতিরই এ দরকার। আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাপারটির দিকে তাকালে প্রশ্নটা দাঁড়ায় কোন্ পথ ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গোটা বিকাশ, এবং বহুল পরিমাণে মানবসমাজের ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটবে।

গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য একটি রাস্তা দেখিয়েছে। আমি "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" কথা বলতে চাইছি। এ পথের পরিণতি কী ঘটেছিল? এর পরিণতিতে পৃথিবী বৈরী সামরিক-রাজনৈতিক জোটে বিভক্ত হয়েছিল, অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, বহু দেশের অভ্যন্তরীণ জীবন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

এর ক্রূর পরিণামে মানুষের গণ-উৎসাদনের উপায়সমূহ অবিশ্বাস্য রকমে

বেড়ে গিয়েছিল। এ মানবপ্রতিভার অনন্যসাধারণ সাফল্যসমূহকে আশীর্বাদ থেকে পাপে পরিণত করার এক বিস্ময়কর সামর্থ্যকে প্রকট করেছিল। আমরা কার্ল মার্ক্‌স-এর বক্তব্যকে স্মরণ না ক'রে পারি না। তিনি পুঁজিবাদের অধীনে প্রগতিকে সেই নিষ্ঠুর দেবতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন যে দেবতা নিহত ব্যক্তির মাথার খুলিতেই শুধু অমৃত পান করতে চায়।.........

"ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" মূলোচ্ছেদ করার জন্য দরকার ছিল এর উদ্‌যোক্তাদের বলপ্রয়োগ এবং বলপ্রয়োগের হুমকির উপর নির্ভর ক'রে সমাজতন্ত্রকে খতম করার, জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি-বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারবার আশা যে দুরাশা তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বোঝানো। তাদের আশা যে দুরাশা তা তাদের বোঝানোর একটিমাত্র উপায় ছিল—সেটি হল বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে, মানব-জাতির কাছে প্রগতি, মুক্তি ও শান্তি আনয়নকারী একটি শক্তিতে পরিণত করা।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা পৃথিবীর পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ক'রে এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে চাপ ও হুমকির, উত্তেজনা ঘোরালো করার কর্মনীতি চালিয়ে যাওয়া বৃথা ও বিপজ্জনক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে চিন্তাধারাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিয়ত একইভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল তা পুঁজিবাদী দুনিয়াতেও ক্রমশ ব্যাপকতর সমর্থন লাভ করতে শুরু করল। আর এরই মধ্যে, শ্রদ্ধেয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, আমরা একত্রে যথার্থই গর্বিত চিত্তে সেই শান্তিকামী নীতির ঐতিহাসিক মূল্য দেখতে পাই যে-নীতিতে আমাদের উভয় রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত, তাদের নিজের নিজের মত করে বিরাট অবদান রাখছে।.........

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসানের এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামের গোটা রণাঙ্গনে অগ্রগতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বহু দশক ধরে এ সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। আমাদের চেষ্টার, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চেষ্টার, সব শান্তিকামী দেশগুলির চেষ্টার ইতিমধ্যেই স্থায়ী ফল ফলতে শুরু করেছে।..... এবং বন্ধুপ্রতিম ভারতের সংসদকে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে সোভিয়েত ভূমি সেই দিনটি নিকটতর করার জন্য তার যথাশক্তি চেষ্টা করবে যেদিন পারস্পরিক ধ্বংসের উপায়গুলির বিনাশ সম্বন্ধে মহত্তম মনীষীদের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হবে।.........

যে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পথ নির্ধারণ করা

হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সে পথে এগিয়ে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা অবশ্য এই ধারণা থেকেই অগ্রসর হই যে মার্কিন পক্ষও একইভাবে কাজ করবে।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,

এটা দেখে আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করি যে আন্তর্জাতিক জীবনে যে সদর্থক পরিবর্তনগুলি ঘটেছে বিরাট এশিয়া মহাদেশ তার বাইরে প'ড়ে নেই। এশিয়াতেও উত্তেজনা প্রশমন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের যানটি ইতিমধ্যেই চলতে শুরু করেছে আর তা আরও গতিশীল হয়ে উঠছে।

এশিয়ার পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে জটিল হয়ে রয়েছে। সেখানে এখনো কামানের গর্জন চলছে এবং দেশপ্রেমিকদের রক্ত ঝরছে। এখানে এখনো বেশ কিছু জটিল বিরোধ, বড় বড় অমীমাংসিত সমস্যা, আন্তঃবিরোধ ও উত্তেজনার ভয়াবহ ক্ষেত্র রয়ে গিয়েছে।..............

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে এই আস্থার ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এখানে স্থায়ী শান্তি অর্জন করা যেতে পারে, এবং একটি সুস্থিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেতে পারে যা এইসব দেশের প্রচেষ্টাকে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জরুরী কর্তব্যকর্মসমূহের দিকে সংহত করার পক্ষে অনুকূল।

এশায় রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও তাকে সুদৃঢ় করার জন্য আংশিক ও সামূহিক এই উভয় প্রকৃতির বাস্তব পন্থা ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ সন্ধান করা হচ্ছে বেশী বেশী ক'রে। এই সমস্যাগুলিই এশিয়ার জনগণ গভীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখছে, আর আমরা এটাকে একটা প্রধান সাফল্য ব'লে মনে করি।

এশিয়ার শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের চিন্তার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ অনেকগুলি আকর্ষণীয় উদ্‌যোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যথা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিরপেক্ষ করার ভাবনা, দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের এমন একটা সূত্র সন্ধান যা তাদের মধ্যেকার সুপ্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করবে, ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করার প্রস্তাব এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিকল্পনা।

যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এশিয়ার নিরাপত্তা সুরক্ষিত ক'রার ধারণা সম্পর্কেও আগ্রহ বেড়ে উঠছে। এটা সকলেই জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ধারণার দৃঢ় সমর্থক। এর কারণ শুধু এই নয় যে আমাদের দেশের বিরাট অংশ এশিয়াতে অবস্থিত। যে মহাদেশে মানব সমাজের অর্ধেকের বেশী লোক বসবাস করে সেই এশিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সারা বিশ্বের জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পক্ষে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে ব'লে আমরা মনে করি।

এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু ব্যাপারটির রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক দিকটিও বিবেচনা করে থাকি। স্থায়ী শান্তি পেলে এশীয় দেশসমূহ এই প্রথম তাদের সামনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে এবং সংস্কৃতির অগ্রগতিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করা তাদের পক্ষে সহজতর হবে।

সেই পঞ্চাশের দশকে এশীয় দেশগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার অভিমুখে তাদের আন্তঃসম্পর্ক বিকাশের মূলনীতিগুকি রচনা করেছিল। এগুলি ছিল বান্দুং-এর মূলনীতি এবং পঞ্চশীলের কর্মনীতি—ভারতের কাছে যেগুলি বিশেষভাবে প্রিয়।

পরে কতকগুলি কারণে এই প্রক্রিয়া যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সে কারণ-গুলির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা মনে করি যে, ব্যাহত আন্দোলনকে পুনরায় শুরু করার সময় এখন এসেছে।

এই কারণে এটা মনে হয় যে এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা নিয়ে পুরোদস্তর ও সর্বাত্মক আলোচনা করার এটাই উপযুক্ত সময়। এই আলোচনা মহা-দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সন্ধানে সাহায্য করবে। মোদ্দা কথা, আমরা চাই একটি সক্রিয়, ব্যাপক ও গঠনমূলক আলোচনা যা জরুরী সমস্যাগুলির উপলব্ধি গভীরতর করায় সাহায্য করবে। সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এর যথোপযুক্ত পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছে। এশিয়া শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার মহাদেশ হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে তা অবশ্যই হতে হবে। আর এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়াস ও সংগ্রাম করা যথোচিত হচ্ছে।

সত্যিই এটা একটা সংগ্রাম। কারণ শান্তি ও উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধী শক্তি, বেশ প্রভাবশালী ও বহু বিরোধী শক্তি এখনো আছে। প্রধানত এরা হচ্ছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শক্তি যারা প্রত্যক্ষভাবেযুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত, যতদূর সম্ভব ব্যাপক অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধিতে আগ্রহী। অধিকন্তু, এগুলি আমাদের গ্রহের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন মহাদেশে বিদ্যমান চরম প্রতিক্রিয়াশীল, বর্ণদ্বেষী, গুপ্ত ও প্রকাশ্য উপনিবেশবাদের এবং সম-সাময়িক কালের বিভিন্ন রূপের ফ্যাসিবাদের শক্তিও বটে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে যে মোড় ফেরা দেখা দিয়েছে এরা তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে যেন এক যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে। এরা

সেই একই শক্তি যারা সংগ্রাম করছে সামাজিক প্রগতি, স্বাধীনতা, মুক্তি ও জাতিসমূহের সমানাধিকারের বিরুদ্ধে।

এই সবকিছুই স্থায়ী শান্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতার অভিমুখে মানবসমাজের অগ্রগতির পথে বহু বাধা সৃষ্টি করছে। যে লক্ষ্যগুলিকে মনে হবে স্বতঃস্পষ্ট ও জাতিসমূহের এত কাম্য সে লক্ষ্যগুলি অর্জন করা সহজ ও সরল ব্যাপার নয়। সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শত্রুদের প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য অধ্যবসায়, উদ্যম, প্রস্তুতি ও দক্ষতা দরকার। দরকার যারা শান্তি ও প্রগতির সপক্ষে তাদের সক্রিয় সংহতি। এ ব্যাপারে প্রতিটি শক্তিকামী দেশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ, আর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত দেশের অবদান যারা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।………

সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বলতে পারি মধ্যপ্রাচ্যে তার কোন প্রকার সংকীর্ণ স্বার্থ নেই। আমাদের শুধু একান্ত কামনা এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বিশ্বের সেই এলাকায় শেষপর্যন্ত প্রকৃত স্থায়ী শান্তি, ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দিক থেকে এই লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার জন্য সবকিছুই করবে।

আরব জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত আদর্শের প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জানিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত প্রজাতন্ত্র যে অবস্থান গ্রহণ করেছে আমরা তার উচ্চমূল্য দিই। ভারত যে এই অবস্থান গ্রহণ করেছে সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বিপরীতপক্ষে শান্তি ও জাতিসমূহের অধিকারের জন্য সক্রিয়ভাবে কর্মরত শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা তার সাধারণ ভূমিকা নির্দেশ করছে।

এটা বলা যেতে পারে, স্বাধীনতালাভের পরে ভারত স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ ক'রে নবীন রাষ্ট্রগুলির কাছে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির প্রথম প্রধান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মঞ্চ ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনের সে ছিল অন্যতম উদ্যোক্তা। ভারত জোট-নিরপেক্ষতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও তার প্রগতিশীল মূলনীতিগুলি প্রণয়নে তার অবদান ছিল। উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা. সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের বিরোধিতা, জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামী জাতিসমূহকে সমর্থন এবং শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূলনীতিগুলির প্রতি নিষ্ঠা—এইসবের জন্য ভারতের নীতি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে।

এটা সকলেই জানে যে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় ভারত প্রভূত অবদান রাখছে। তারই সক্রিয় অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়েছে এবং এই চুক্তিগুলিতে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হয়েছে। আজ এই প্রথম এই উপমহাদেশে অবস্থা সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের দিকে, পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার দিকে গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সমস্ত আন্তরিক বন্ধুদের, সমস্ত খাঁটি শান্তিকামী রাষ্ট্রের কাছে এই ঘটনাপ্রবাহ গভীর আনন্দের বিষয়।

এ কথাটা আর গোপন নয় যে ভারতের নতুন ভূমিকা, তার বর্ধিত মর্যাদা ও প্রভাব বিশ্বে সকলের কাছে পছন্দসই নয়। কেউ কেউ চেষ্টা করছে এর বিরুদ্ধতা করার। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বলতে পারি যে আমরা এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই। ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ভূমিকার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গভীর গণতন্ত্রীকরণের, যেসব জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপরের অনুসৃত নীতির নিষ্ক্রিয় পদার্থরূপে গণ্য ছিল, আজ আন্তর্জাতিক জীবনে সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারী হিসাবে ও তার রূপকার হিসাবে তাদের রূপান্তরের বর্তমান প্রক্রিয়ার প্রকাশ। ভারতের নতুন ভূমিকাকে আমরা এ কারণেও স্বাগত জানাই যে তার কর্মনীতি এমন সব লক্ষ্য অর্জনের দিকে চালিত যা সোভিয়েত কর্মনীতিরও লক্ষ্য। এগুলি হচ্ছে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শান্তিকে সংহত করা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো।

ভারতের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার বছরগুলি একই সঙ্গে হয়েছে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীকে জোরদার করার বছর। আমরা শুরু করেছিলাম সামান্য কয়েকটি যোগসূত্র দিয়ে এবং এসে পৌঁছেছি নানা ধরনের ক্ষেত্রসমূহে ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক সহযোগিতায়—যার ভিত্তি হচ্ছে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি।

এটা আমরা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার আরো বিকাশ ঘটানোর কর্তব্যকর্ম বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেত্রী ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক শ্রীমতী ইন্দিরা নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ উপলব্ধি ও সক্রিয় সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে।

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর, সে ধারণা

[illegible] সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সঙ্গে [illegible] করেছে। আমাদের সম্পর্ককে আরো সফলভাবে বিকশিত করার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তভিত্তি।

আমি এই আশাই প্রকাশ করি যে ভারতের সংসদও সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার বিকাশে কাজ ক'রে যাবে। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরাও এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ ক'রে যাব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীকে সবদিক থেকে শক্তিশালী ক'রে তোলার যে সংকল্প আমাদের আছে তা অটল ও অপরিবর্তনীয়।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, উপসংহারে আপনাদের মাধ্যমে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভারতের মহান জনগণকে, কামনা করছি তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি।

ধন্যবাদ।

[ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী), ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪]

গ্রন্থপঞ্জী

BOOKS

A Strat[illegible] for India for a Credible Posture Against a Nuclear Adversary (New Delhi, The nstitute for [illegible] Studies and Analyses, 196[illegible]

Balab[illegible]vich, V. V. and Bimla Pra[illegible], eds., India and the Soviet Union (Delhi, P.P H. 1969).

Bimal Prasad, ed., Indo-Soviet Relations : 1947-1972, A Documentary Study (New Delhi, Allied Publishers, 1973).

Budh[illegible]j, Vijay Sen, Soviet Russia and the Hindustan Subcontinent (Bombay, Somaiya, 1973).

Ch[illegible], Pran, Before and After the Indo-Soviet Treaty (New Delhi, S. Chand, 1971).

Gh[illegible]te, N. M., ed., Indo-Soviet Treaty : Reactions and Reflections New Delhi, Din Dayal Research Instt., 1972).

Indo-Soviet Relations, a collection of statements and essays by poli-tical leaders and academicians (Bombay, Popular Prakashan, 1969).

[illegible] A.P., ed., Shadow of the Bear The Indo-Soviet Treaty [illegible]ew Delhi, 1971).

[illegible] Harish, USSR a[illegible] [illegible]dia [illegible], Institute of [illegible] [illegible], 1969).

[illegible] Soviet Russia and Asia, [illegible] (Univ. De Geneve [illegible]

[illegible] Devendra, Bharat aur [illegible] Soviet Rus Ke Sambandh (New Delhi. Prerna Prakashan, 1971).

Menon K. P. S., The Indo-Soviet Treaty : Setting and weaning (Delhi Vikas Publications, 1971).

-Indo-Soviet Treaty : Setting and Sequel (Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1972 2nd edn).

Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations (New York, A. Knof, 1956).

. The Impasse of American Foreign Policy (University of Chicago, 1962).

Mujeeb, M., India and the U.S.S.R. (New Delhi, I.C.W.A. 1949).

Ghosh, Litto and Kartar Singh, ed. Unity in Diversity : 50 Glorious years of Union of Soviet Socialist Republics (New Delhi, National Celebration Committee Indo-Soviet Cultural Society,) 1973).

Neelkant, K, Partners in Peace : A Study in Indo-Soviet Relations (Delhi, Vikas Publishing House, 1972).

Roy, Hemen, Indo-Soviet Relations : 1955-71). Bombay, Jaico Publishing House, 1973).

Sarma, Chattar Singh, India and Anglo-Soviet Relations, 1917-1947 (Bombay, Asia Publishing House, 1959).

Schuman, Fredrick L., International Politics (New York, McGraw-